একাধিক উপাস্য কি সত্য না সেফ এক উপাস্য?

আবু কাব আনীসুর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস

একাধিক উপাস্য কি সত্য
না
সের্ফ এক উপাস্য?

লেখক
আবু কাব আনীসুর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস
(এম.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং)

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী,
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা
০১১৯৮১৮০৬১৫

একাধিক উপাস্য কি সত্য না সের্ফ এক উপাস্য?

লেখক: আবু কাব আনীসুর রহমান বিন আব্দুল কুদ্দুস

(এম. এস.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং)

প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০১১/যুলহিজ্জাহ, ১৪৩২

কম্পিউটার কম্পোজ : আবু আমিনাহ জায়েদ

মুদ্রণ: ঢাকা প্রিন্টার্স।

বিনিময়: ৭০.০০ (সত্তর টাকা) মাত্র।

Ekadhik Upashya Ki Sotya Na Serf Ek Upashya? (Are Many Gods true or One God?) by A.K. Anisur Rahman, Pablished by Jayed Library. 59, Sikkatully Lane, Dhaka. Julhijja 1432Hijrah. November 2011. Price : 70.00 Tk. only.

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আসমানসমূহ ও যমীনের পয়দা, পরিচালনা, কিসমত, হেফাযত এ সকলকর্ম একজন সর্বশক্তিমান দ্বারাই সম্পাদিত হচ্ছে। তিনিই একমাত্র উপাস্য, একমাত্র সাহায্যকর্তা ও আশ্রয়স্থল। হিকমতদার কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

যদি [আসমানসমূহ ও যমীন] এ উভয়ের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আরো উপাস্যসমূহ থাকত তবে এদের মধ্যে সবসময় ফ্যাছাদ লেগে থাকত। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ২২)

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের কাছেও দোয়া করে অথচ এর পক্ষে তার কাছে বোরহান নেই তার হিছাব তার পালনকর্তার কাছেই হবে। (সূরা আল-মুমিনুন ২৩ঃ ১১৭)

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ﴾

[কাফিরদেরকে] তুমি বল, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে তাদের কাছে দোয়া কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনে যাররা পরিমাণও কিছুর মালিক নয়। (সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২২)

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার নিবাস জাহান্নাম। (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৭২)

﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

নবী ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন, হে আমার কারাগারের সাহেবদ্বয়! আলাদা আলাদা পালনকর্তা ভালো না কি কহরওয়ালা এক আল্লাহ?

(সূরা ইউসূফ ১২ ঃ ৩৯)

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ) যিনি আর্তের জওয়াব দেন যখন সে তার কাছে দুআ করে এবং দুঃখকষ্ট দূর করেন এবং তোমাদেরকে ধরণীর খলীফা করেন। আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য আছে কি? (সূরা আন-নামল ২৭ঃ ৬২)

এক উপাস্যে বিশ্বাস তথা তাওহীদের যথার্থতা এবং বহু-ঈশ্বরবাদের অসারতা সম্পর্কে তাসনীফকৃত কয়েকটি নিবন্ধের সমাহার এই মুখতাছার কিতাবটি। নিবন্ধগুলো এর আগে মাসিক আল-মাদানী ও মাসিক মুসলিম ডাইজেস্ট পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এজহার হয়েছে। নিবন্ধগুলিকে খানিকটা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে এই কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

আলীশান, দয়াবান আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের একমাত্র মাকসুদ। নিবন্ধসমূহে যেসব হুজ্জত, বোরহান ও দলীল আরয করা হয়েছে সেগুলো যেন লেখক ও পাঠকদের ঈমান যিয়াদত করে এবং তাদের কলবসমূহ থেকে জাহের ও খফী শিরক খারিজ করে দেয় এটাই হেদায়াতের মালিক আল্লাহর কাছে আমাদের খালেস দোয়া।

কিতাবটি নশর করার কাজে যারা তায়ীদ ও নুসরত করেছেন তাদের সকলের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। আর সকল তারীফ আলমসমূহের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম সকল রাসূলগণের জন্য।

আবু কাব আনীসুর রহমান

২৯ শে রজব ১৪৩২ হিজরী

২রা জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

ভুল-বিচ্যুতি ও মতামত জানাতে ই-মেইল করুন

কুরআনে বর্ণিত বিস্ময়কর তথ্যাদি

কুরআন বিস্ময়ের একটি খনি। এটি মানুষের জন্য সঠিক পথের দিশা সম্বলিত একটি কিতাব যা মানুষের পয়দাকারী মহান আল্লাহ রচনা করেছেন এবং তাঁর বার্তাবাহক হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

কুরআন নাযিল হয়েছিল ৬১০ থেকে ৬৩২ ঈসায়ী সনের মধ্যবর্তী সময়ে। কুরআনে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং প্রাকৃতিক রহস্য বর্ণিত হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে ঐ সময়ের মানুষের সামান্যতম জ্ঞানও ছিল না এবং সেগুলির সত্যতা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত হয়েছে কুরআন নাযিলের অনেক পরে। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এতগুলি ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়া অসম্ভব যখন ইতিহাসবিদ ও বিজ্ঞানীগণ নিজেরাই এসব বিষয়ে অন্ধকারে ছিলেন।

বিভিন্ন কিছিমের মানুষ বিভিন্ন কারণে কুরআনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। একজন ভাষাবিদ কুরআনের বালাগাত বা অলংকার লক্ষ্য করেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি কুরআনের ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর জরুরত অনুভব নাও করতে পারেন। একজন ইতিহাসবিদ কুরআন অধ্যয়ন করলে কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার বিশুদ্ধতাই আগে নজরে পড়বে। একজন গণিতবিদের চোখে কুরআনের শব্দ ও বর্ণের গাণিতিক বিন্যাস, সমাবেশ ও সংখ্যাগত তথ্যসমূহ ধরা পড়ে; কুরআনের উপর ঈমান আনার জন্য সেটাই তার কছে যথেষ্ট। অন্যদিকে বিজ্ঞানচর্চাকারীরা কুরআনের বর্ণিত তথ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাওয়া ফলাফলের সাথে মিলিয়ে দেখতে চান।

কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য

(১) ইরাম শহর ও কওমে আদ সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনাঃ

হিকমতপূর্ণ কুরআনে ইরাম শহর ও কওমে আদের কথা বলা হয়েছে। অথচ কুরআন নাযিলের সময়ে এমন কি ১৯৭৩ সনের আগ পর্যন্ত 'ইরাম' শব্দটি ইতিহাসবিদগণের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। ইহুদী নাসারা ও মাজুসী ধর্মের কোন কিতাবেও ইরাম নামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴾

তুমি কি দেখনি তোমার রব কি করেছিলেন আদ কওমের। থাম্বাবিশিষ্ট ইরাম (শহর) কে? যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নি।
(সূরা আল-ফজর ৮৯ ঃ ৬-৮)।

১৯৭৩ সনে সিরিয়ার অতি পুরাতন শহর Eblus-এ খনন কাজের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটির ফলকের উপরে কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা পুস্তকের এক বিরাট লাইব্রেরীর সন্ধান পেয়েছেন। এই ফলকসমূহের কতকগুলি চার হাজার বছরেরও বেশি পুরাতন। এখানে প্রাপ্ত ফলক পড়ে জানা যায় যে Eblus শহরের বসিন্দারা ইরাম শহরের বাসিন্দাদের সাথে তেজারত করত। (National Gographic, 1978)

১৯৭৩ সালে ইতিহাসবিদদের কাছে ইরাম শহরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হল। তবে ইরাম শহর সম্পর্কে জানার বাকী রয়ে গেছে। মুসলিমরা কুরআন পড়েই ইরাম শহরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

(২) মিসরের ইতিহাস ঃ ইউসুফ عليه السلام-এর সময়ে মিসরে বনী ইসরাঈলের আগমন এবং মূসা عليه السلام-এর সাথে মিসর থেকে তাদের ফিলিস্তীনে হিজরত মিসরের ইতিহাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দুইটি ঘটনা বাইবেলে ও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুইটি বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। বাইবেলে উভয় সময়ে মিসরের শাসককে 'ফেরাও' বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে কেবল মূসা عليه السلام-এর সময়ের শাসককে ফিরাউন বলা হয়েছে এবং ইউসুফ عليه السلام-এর সময়ের শাসককে মালিক (বাদশাহ)

বলা হয়েছে। (দেখুন সূরা বাক্বরাহ ২ ঃ ৪৯, সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৫০ এবং সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ৪৩)

বর্ণনার এই ভিন্ন ভংগীর কারণ আগে বোঝা যায়নি। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবিদগণের গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, ঈসা ﷺ-এর জন্মের প্রায় ১৪০০ বছর আগে চতুর্থ আমেনহোতেপ-এর সময় থেকে মিসরীয় বাদশাহগণ ফিরাউন উপাধি ব্যবহার করতেন, তার আগে নয়। ইউসুফ ﷺ চতুর্থ আমেনহোতেপ এর কমপক্ষে দুইশত বছর আগে মিসরে ছিলেন। বাইবেলে ইউসুফ ﷺ-এর সময়ের বাদশাহকে ফিরাউন বলে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাইবেলের রচনাকারীদের দ্বারা সংঘটিত একটি ভুল যারা মূসা ﷺ-এর ওফাতের কয়েক শতাব্দী পরে এটি রচনা করেছিলেন। (Moses and Pharaoh): The Hebrews in Egypt, Maurice Buchaille. Tokyo, 1994 p. 176)

(৩) ধরনীর সবচেয়ে নিচু স্থলভূমিতে সংঘটিত যুদ্ধ : ৬১৩ ঈসায়ী সনে ফিলিস্তীনের বাহরে লুত বা ডেডসী-র কাছাকাছি এলাকায় রোমান ও পারসিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারসিকরা রোমানদের থেকে যেরুসালেম আন্তাকিয়া ও দিমাশক ছিনিয়ে নেয়। মক্কার মুশরিকরা এতে উল্লসিত হয় এবং বলতে থাকে, "আমরাও অচিরেই মুসলিমদেরকে পরাজিত করব।" তাদের এই কথার প্রেক্ষিতে কুরআনের ৩০নং সূরাহ আর-রূমের আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

﴿غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

রোমানরা পরাজিত হয়েছে ধরণীর সবচেয়ে নিচুভাগে। কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই গালেব হবে কয়েক বছরের মধ্যেই। আগের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন ঈমানদাররা উৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন।

(সূরা আর-রূম ৩০ ঃ ২-৫)

أدنى - শব্দের মানে নিকটবর্তী, সবচেয়ে নিচু বা নিচুমান সম্পন্ন।

أدنى الأرض শব্দাবলীর দ্বারা যেরুসালেম ও জর্দান পরিবেষ্টিত এলাকাকে বুঝানো হয়েছে যেখানে ঐ যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়েছিল। আজ আমরা জানি যে ঐ এলাকাতে আছে বাহরে লুত বা ডেড সী, যার উপকূল সমুদ্র সমতল থেকে ৪২০ মিটার নিচে অবস্থিত এবং এটাই ধরণীর মধ্যে নিচুতম শুকনা স্থলভূমি।

بضع শব্দ দ্বারা তিন থেকে নয়ের মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা বুঝায়। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৬২২ ঈসায়ী সনে রোমানরা পারসিকদেরকে পরাজিত করে। আর ৬২৩ ঈসায়ী সনে মুসলিমরা বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদেরকে পরাজিত করে।

(৪) মরিয়াম (আঃ)-এর জন্মের বিবরণঃ খ্রিস্টানদের কাছে যে বাইবেল মওজুদ আছে তাতে মরিয়াম عليها السلام-এর জন্মের কোন বিবরণ নেই। কিন্তু কুরআনে মরিয়াম عليها السلام-এর জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মরিয়াম (আঃ)-এর মা (হান্নাহ) তাঁর গর্ভস্থিত সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। কিন্তু তিনি কন্যা সন্তানের জননী হন। তাঁর নিয়ত পূরণের উদ্দেশ্যে মরিয়াম عليها السلام-কে কিশোরী অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি হুজরায় ইবাদত করতে দেয়া হয়।

আলেম নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রত্যেকেই এই পূর্ণবতী কিশোরীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হন। অবশেষে তারা কলম নিক্ষেপ করে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করেন এবং যাকারিয়া عليه السلام এই দায়িত্বলাভ করেন। এই বিবরণ মহান আল্লাহ কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ ﷺ ও মানব জাতিকে অবহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

এটা গায়েবের খবরসমূহের একটি। তোমার কাছে ওহী নাযিল করেছি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। তাদের মধ্যে কে মরিয়ামের তত্ত্বাবধান করবে [তা নির্ণয়ের জন্য] আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল।

(সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৪৪)

বস্তুতঃ মরিয়াম ﷺ-এর জন্মকাহিনী খ্রিস্টানদের বাইবেলে অন্তর্ভুক্ত কোন পুস্তিকাতে নেই। ১৯৫৮ ঈসায়ী সনে আদিম খ্রিস্টানদের একখানি পুস্তিকা Gospel of James এর অংশবিশেষ পাওয়া যায়, যাতে মরিয়াম ﷺ-এর জন্মের এই কাহিনী রয়েছে। এই পুস্তিকাটি কুরআন নাযিলের তিনশত বছর আগে থেকেই নিষিদ্ধ ও বিনষ্টযোগ্য বলে ঘোষিত ছিল।

কুরআনে ঈসা ﷺ কে হারুন ﷺ-এর বংশধর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾

হে হারূনের বোন [হারূন ﷺ-এর বংশধর অর্থে] তোমার পিতা অসৎব্যক্তি ছিলেন না আর তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী।

(সূরা মারয়াম ১৯ : ২৮)

আসমান-যমীনের পয়দায়েশ সম্পর্কে কুরআন

কুরআনে আসমান-যমীনের পয়দায়েশ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(ক) আদিতে আসমান ও যমীন একত্রিত বস্তু হিসাবে বিদ্যমান ছিল, পরে তা থেকে আসমান ও যমীনকে আলাদা করা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾

"যারা কুফর করে তারা কি দেখে না যে আসমানসমূহ ও ধরণী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল এরপর উভয়কে আলাদা করলাম?"

(সূরা আম্বিয়া ২১ : ৩০)

(খ) আসমানসমূহকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করার আগে এগুলি ধুম্রপুঞ্জরূপে বিদ্যমান ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾

"এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ।"

(সূরা হা-মীম আস-সিজদাহ ৪১ : ১১)

(গ) আসমানের পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾

আমি আমার হাত (ক্ষমতা) দিয়ে আসমান নির্মাণ করেছি এবং অবশ্যই আমি সম্প্রসারণকারী। (সূরা আয-যারিয়াত ৫১ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

(সূরা ইয়াসীন– ৩৬ঃ৪০, সূরা আম্বিয়া ২১ঃ ৩৩)

কুরআনে বর্ণিত এই ধারণাগুলি কুরআন নাযিলের চৌদ্দ শতাব্দী পরে বিজ্ঞানীদের নিকট ধরা পড়েছে। ১৯২৭ সালে বিজ্ঞানী লেমেটিয়ের পহেলা একটি ধারণা ব্যক্ত করেন যে, গ্যালাক্সিসমূহ পয়দা হওয়ার আগে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি পিন্ডে ঘনীভূত ছিল। ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল তার পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে. গ্যালাক্সিসমূহ একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে মহাবিশ্ব এখনও প্রসারণশীল অবস্থায় আছে। এর ফলে লেমেটিয়ের-এর মতবাদের মূল ধারণাটিও বিজ্ঞানীদের কাছে সমর্থন লাভ করে।

ষ্টিভেন ভাইনবার্গ ১৯৭৭ সনে তার The First three minutes : A Modern View of the Origin of the Universe নামক পুস্তকে লিখেছেন, মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ গঠনের আগে মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করছিল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে, যেসব জায়গায় দুই সমুদ্র পাশাপাশি অবস্থান করে সেখানে উভয়ের সীমান্তে একরকম প্রতিবন্ধক (barrier) থাকে। এই প্রতিবন্ধক দুইটি সমুদ্রকে বিভাজন করে রাখে যাতে প্রত্যেক সমুদ্র তার নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ ভূমধ্যসাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগরের পানির তুলনায় উষ্ণতর, অধিক লবণাক্ত এবং কম ঘনত্বসম্পন্ন। যখন ভূমধ্যসাগরের পানি জিব্রাল্টার প্রণালীর তলদেশের উপর দিয়ে আটলান্টিক

মহাসাগরে প্রবেশ করে তখন এটা সমুদ্র সমতল বরাবর অবস্থান না করে আটলান্টিকের গভীরে প্রায় এক হাজার মিটার নিচে তার নিজস্ব উষ্ণতা, লবণাক্ততা ও ঘনত্ব নিয়ে অবস্থান করে।

(Principles of Oceanography, Davis, 1972, P. 92-93)

এভাবে আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরের সীমান্ত নির্দিষ্ট।
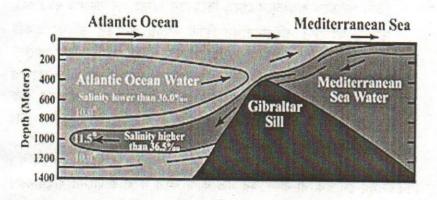
চিত্র : দুই দরিয়ার মাঝে নির্ধারিত সীমান্ত

কুরআনে মহান আল্লাহ এই ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾

"তিনি বহমান রাখেন দুই সমুদ্রকে যারা একে অন্যের সাথে মিলিত হয়; উভয়ের মধ্যে আছে বারযাখ যা তারা অতিক্রম করতে পারে না"

(সূরা আর-রাহমান ৫৫ ঃ ১৯-২০)

৩। যমীনের স্থিতি রক্ষায় পর্বতের ভূমিকা ঃ

যমীনের কম্পনরোধে পর্বতের ভূমিকার কথা কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। যেমন,

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

ধরণীতে পয়দা করেছি শক্ত পর্বতমালা যাতে তা ওদেরকে নিয়ে কম্পিত না হয়। (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৩১)

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾

যমীনকে কি করি নাই বিছানা এবং পর্বতসমূহকে কীলক?

(সূরা আন-নাবা ৭৮ ঃ ৬-৭)

﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾

তিনি পর্বতকে শক্তভাবে গেড়ে দিয়েছেন। (সূরা আয-নাযিআত ৭৯ ঃ ৩২)

ভূতত্ত্বে যমীনের বহিরাবরণের স্থিতি রক্ষায় পর্বতের ভূমিকা একটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত তথ্য। যমীনের বহিরাবরণ (crust) একটি কঠিন খোলের মত। অন্যদিকে গভীরতর তবকসমূহ গরম এবং তরল। চৎবংং ও ঝরবাবৎ এর মতে যমীনের বহিরাবরণের স্থিতি রক্ষায় পবর্তসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধরণীর ব্যাস প্রায় ১২,০৬৬ কি. মি. এবং এর বহিরাবরয়ণ খুব পাতলাঃ মাত্র ১.৬ থেকে ১৬ কি. মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট। যেহেতু বহিরাবরণটি পাতলা, সেহেতু এর কম্পনের প্রবণতা খুব বেশি। পর্বতসমূহ পেরেক বা কীলকের মত কাজ করে ফলে জমীনের বহিরাবরণ স্থিতিলাভ করে। মহাসাগরসমূহের নিচে যমীনের বহিরাবরণ মাত্র ৫ কি.মি. পুরু, মহাদেশীয় সমতলে এটি প্রায় ৩৫ কি. মি. পুরু এবং বড় বড় পর্বতমালার নিচে এটি প্রায় ৮০ কি. মি. পুরু। এগুলি শক্ত বুনিয়াদ যার উপর পর্বতসমূহ দাঁড়িয়ে থাকে।

(Earth, Press and Siever. 1982, San Francisco P-435)
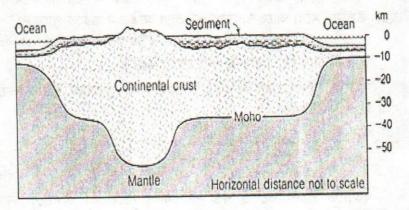
চিত্র : কীলকের ন্যায় পর্বত

৪। পানিচক্র

কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলিতে পানিচক্রের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾

আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি নাযিল করি এরপর তা যমীনের মধ্যে সংরক্ষিত করি আমি একে অপসারণ করতেও সক্ষম।

(সূরা আল-মুমিনুন ২৩ : ১৮)

তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদবাহীরূপে তাঁর রহমতের পূর্বে [অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে] এরপর যখন তা ভারী মেঘবহন করে তখন তাকে নির্জীব ভু-খণ্ডের দিকে চালনা করি।

(সূরা মায়িদাহ ৭ : ৫৭)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾

তুমি কি দেখ না আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাযিল করেন এরপর তাকে যমীনে ঝরণারূপে বহমান করেন এবং তা দিয়ে মুখতালিফ রঙের ফসল উৎপন্ন করেন?

(সূরা আয-যুমার ৩৯ : ২১)

১৪০০ বছর আগের অন্য কোন কিতাবেই পানিচক্রের এমন শুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ১৫৮০ ঈসায়ী সনে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পহেলা ব্যক্তি হিসাবে বার্নার্ড পালিসি পানি চক্রের আধুনিক ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, সাগর থেকে পানি বাস্পীভূত হয় এবং ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ গঠন করে। মেঘ মূলভূমির উপরে এসে উঁচুতে ওঠে, ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টি হয়ে ঝরে।

মেঘের সঞ্চালন ও বজ্রবিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ব্যক্ত হয়েছে কুরআনের এই আয়াতে ঃ

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾

তুমি কি দেখ না আল্লাহ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, এরপর তাদেরকে পুঞ্জীভুত করেন এরপর তুমি বৃষ্টিকে দেখ ওর মধ্য থেকে বের হতে। তিনি আসমান থেকে নাযিল করেন এর পর্বত থেকে শিলাবৃষ্টি। এ দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে একে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা দেখার ক্ষমতা প্রায় কেড়ে নেয়। (সূরা আন-নূর ২৪ : ৪৩)

এই আয়াতে বৃষ্টি বর্ষণের পরে শিলাবৃষ্টি ও এরপর বিদ্যুতের কথা বলা হয়েছে এ থেকে বুঝা যায় যে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় শিলাপিন্ডে। আরো লক্ষণীয় যে এ আয়াতে আসমানে অবস্থিত পর্বতের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে আসমানে ভাসমান শিলামেঘের পর্বত।
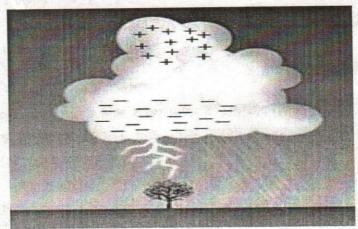
চিত্র : মেঘ

বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, শিলাপিন্ডে উৎপন্ন নেগেটিভ চার্জ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আরো জানা গেছে যে, যেসব মেঘ থেকে শিলা বর্ষিত হয় সেগুলোর উচ্চতা ৭৬০০ মিটার থেকে ৯১০০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫। মৌমাছিদের জ্ঞান ও সামাজিক কাঠামো

মোমাছিদের আচরণ ও ভাব-বিনিময়ের উপর গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সনে বিজ্ঞানী Von-Frisch নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আজ এটা সবাই জানে যে, কর্মী মৌমাছিরা আসলে স্ত্রী মৌমাছি, আর মৌমাছিদের নেতৃত্বে থাকে রাণী মৌমাছি। মৌমাছিরা কোন জায়গায় মধুযুক্ত ফুলের সন্ধান পেলে তাদের সহকর্মীদের কাছে ফিরে যায় এবং তাদেরকে ঐ জায়গার অবস্থান সংকেতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। কুরআন বলে যে, মৌমাছিদের এই জ্ঞান আল্লাহর দান।

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তোমার পালনকর্তা মৌমাছিকে ওহী করেন, ঘর বানাও পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা [মানুষ] যে মাচান তৈরি করে তাতে; এরপর প্রত্যেক ফল থেকে খাও এরপর তোমার পালনকর্তার সহজ পথ সুলুক কর।

(সূরা আন-নাহল ১৬ : ৬৮-৬৯)।

এখানে কুলি (খাও) এবং ইসলুকি (সুলুক কর) এই দুইটি আরবী ক্রিয়াপদ স্ত্রীবাচক। এ থেকে বোঝা যায় যে যেসব মৌমাছি খাদ্য যোগাড় করে তারা স্ত্রী মৌমাছি। অথচ মাত্র তিনশত বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল মৌমাছিদের সমাজে একটি রাজা মৌমাছি থাকে আর কর্মী মৌমাছিরাও পুরুষ।
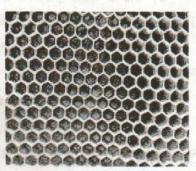
চিত্র : মৌচাক

৬। পিপড়ার জীবনাযাত্রা ও ভাব-বিনিময়

কুরআনের এই আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করা যাক ঃ

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

যখন তারা পিপীলিকার উপত্যকায় পৌছল এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা সকল! তোমরা তোমাদের নিবাসে দাখিল হও যেন সুলায়মান ও তার সৈন্যদল তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে তারা না বুঝতে পেরে। (সূরা আন-নামল ২৭ ঃ ১৮)

অতীতে নিশ্চয়ই কিছু লোক কুরআন সম্পর্কে এরকম মশ্‌করা করার সুযোগ পেত -এই কুরআন কি একটা রূপকথার কাহিনী যেখানে পিপড়ারা একে অন্যের সাথে কথা বলে? প্রাণিবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পিঁপড়ারা একে অন্যের সাথে ভাব-বিনিময় করে। তদুপরি পিঁপড়াদের জীবনযাত্রা মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন ঃ

(১) পিঁপড়াদের নিজেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের উন্নত পদ্ধতি আছে।

(২) তাদের একে অন্যের সাথে মোলাকাত হলে তারা খবরাখবর বিনিময় করে।

(৩) তাদের মধ্যে শ্রম-বিভাজন আছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ ম্যানেজার, কেউ সুপারভাইজার; কেউ ফোরম্যান, কেউ শ্রমিক

(৪) তারা তাদের কেউ মরে গেরে তাকে কবর দেয়, যেমন মানুষরা মুর্দাকে কবর দিয়ে থাকে!

ধরণীতে উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের আবির্ভাব ঃ

মহান আল্লাহসকল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। এগুলো নিজে নিজে পয়দা হয় নি বা বির্তনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আল্লাহ পানি থেকে সকল প্রাণী পয়দা করেছেন এদের মধ্যে কতক তাদের পেটে ভর করে চলে, আর কতক দুই পায়ে বিচরণ করে আর কতক চার পায়ে বিচরণ করে। আল্লাহ তা পয়দা করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (সূরা আন-নূর ২৪ ঃ ৪৫)

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

পবিত্র তিনি যিনি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন প্রত্যেকটির যা উৎপন্ন করে যমীন (অর্থাৎ উদ্ভিদ) আর তাদের নিজেদের ভেতরেও (অর্থাৎ মানুষ) আর সে সবেও যা তারা জানে না। (সূরা ইয়াসিন ৩৬ ঃ ৩৬)

﴿أنشأْنا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

এরপর তা দিয়ে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানাই।

(সূরা আল-মুমিনুন ২৩ ঃ ১৯)

আর পয়দা করি এক গাছ যা সিনাই পর্বতে জন্মে, তা থেকে তেল উৎপন্ন হয় আর ভক্ষণকারীদের জন্য রঙীন তরকারি। (অর্থাৎ যয়তুনের কথা বলা হয়েছে)। (সূরা আল-মুমিনুন ২৩ ঃ ২০)

﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾

তারা কি উটের দিকে নজর দেয় না কিভাবে তাকে পয়দা করা হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়াহ ৮৮ ঃ ১৭)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কখনও একটা মাছিও পয়দা করতে পারে না, এজন্য তারা সবাই একত্রিত হলেও।

(সূরা আল-হাজ্জ ২২ ঃ ৭৩)

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾

স্মরণ কর যখন তোমাদের পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি কালো শুকনো মাটির কাদা থেকে মানুষ পয়দা করছি।'

(সূরা আল-হিজর ১৫ ঃ ২৮)

বর্ণিত আয়াতগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, মহান আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মোতাবিক বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পয়দা করেছেন।

যুক্তিবিদ্যা ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিস্ময় ঃ

গ্যারি মিলার ওরফে আব্দুল আহাদ ওমর একজন কানাডীয় গণিতবিদ, নওমুসলিম এবং ভূতপূর্ব খ্রিস্টান মিশনারী। তিনি কুরআন মজীদকে যুক্তিবিদ্যার নিয়মাবলী দ্বারা পরখ করে দেখেছেন। তিনি মন্তব্য করেন,

"There are no wasted words in the Quran; each verse is perfected. It could not be in a better form. One could not use fewer words to say something or if one uses more wsrds one would only be adding superfluous information."

(The basis of Muslim Belief Singapore, 2000)

অর্থ "কুরআনে কোন অপব্যয়িত শব্দ নেই। প্রতিটি আয়াত চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত। এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন গঠন হতে পারে না। কোন ভাব প্রকাশের জন্য কেউ এর চেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না অথবা যদি কেউ বেশি শব্দ ব্যবহার করে তবে সে এর দ্বারা অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করবে।"

নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলি আব্দুল আহাদ ওমরের 'The Basis of Muslim Belief' পুস্তিকা থেকে নেয়া হয়েছে। কুরআনে ইয়াওমুন (দিবস) শব্দটি আছে ৩৬৫ বার, শাহরুন (মাস) শব্দটি আছে ১২ বার এবং সানাতুন (বর্ষ) এবং সিনীন (বর্ষ) শব্দ দুটি আছে (৭+১২=) মোট ১৯ বার। যদিও দিবস শব্দটির ৩৬৫ বার ব্যবহার ঐ বিষয়টির দিকেই

ইশারা করে। মাস শব্দটির সাথে ১২ সংখ্যাটির সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড়। বছর শব্দের সাথেও ১৯ সংখ্যাটির একটি সম্পর্ক আছে। গ্রীক বিজ্ঞানী মেটন আবিষ্কার করেন যে সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান ১৯ বছর পরপর একই স্থানে আসে। একে মেটনিক সাইকেল বলা হয়।

কুরআনের ১৮নং সূরা (সূরা কাহফ), আয়াত নং ২৫ এ আমরা পড়ি

﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾

তারা গুহায় ছিল তিনশত বছর এবং তা আরো নয় (বছর) বৃদ্ধি কর।

আয়াতটিতে বলা হয়নি যে 'তিনশত নয় বছর'। বরং এখানে তিনশত বছরই বুঝানো হয়েছে এবং এর সমতুল্য তিনশত নয় বছর বুঝানো হয়েছে। বাস্তব ঘটনা হল তিনশত সৌর বছর তিনশত নয় চন্দ্র বছরের সমান। একটি শব্দ ব্যবহার করা ও উল্লেখ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন একটি শব্দকে আমরা ব্যবহার করি তখন শব্দটি যে অর্থ বহন করে শব্দটি দ্বারা সেই অর্থটিকে বুঝি। যখন আমরা শব্দটি উল্লেখ করি তখন আমরা সেই শব্দটি নিয়েই আলোচনা করি।

উদাহরণস্বরূপ যদি আমি বলি TORONTO is a large city তখন আমি বুঝাতে চাই টরোন্টো নামক একটি জায়গা যা একটি বড় শহর। কিন্তু যদি আমি বলি TORONTO has seven letters, তাহলে আমি TORONTO শব্দটি সম্পর্কে বলছি যাতে T, O, R, O, N, T, O এই সাতটি হরফ আছে। প্রথম উদাহরণ শব্দ ব্যবহারের এবং দ্বিতীয় উদাহরণ শব্দ উল্লেখের।

এখন কুরআনের এই আয়াতটি বিবেচনা করুন ঃ

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

অকশ্যই আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা আদমের উপমার মত।

(সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫৯)

আয়াতটিতে অবশ্যই ঈসা ও আদম عليه السلام নামে দুইজন ব্যক্তিকে তুলনা করা হয়েছে। অন্যসব মানুষ যেখানে পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে এই দুইজন ব্যক্তি তাদের ব্যতিক্রম। 'ঈসা' ও 'আদম' শব্দ দুটিকে এই আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে আর ব্যবহারের

দিক দিয়ে বাক্যটি সত্য। কিন্তু যখন আমরা এই বাক্যে শব্দ দুটি ব্যবহার নয় বরং শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করার বিষয়টি বিবেচনা করব, তখনও কি বাক্যটি সত্য থাকবে? এই বাক্যটি যে রচয়িতা রচনা করেছেন তিনি কি এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছিলেন যে, এক সময় লোকেরা শব্দের উল্লেখ করা নিয়ে আলোচনা করবে? হ্যাঁ। কারণ এর রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ। সকল জ্ঞানই তাঁর। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন সেই ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতটিতে আদম ও ঈসা শব্দের অর্থ চিন্তা না করে যদি আমরা কেবল শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করার কথা চিন্তা করি, তবুও বাক্যটি সত্য। কিভাবে আদম শব্দটি ঈসা শব্দের সাথে তুলনীয়? হ্যাঁ, কুরআন মজীদে ঈসা শব্দটি আছে ২৫ বার আর আদম শব্দটিও আছে ২৫ বার। এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআনের শব্দ নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে ১৯৪৫ ঈসায়ী সনের পরে। শব্দনির্দেশিকাটি একজন শায়খ ও তার ছাত্রদের কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফসল যেখানে তারা কুরআনের প্রতিটি শব্দকে তালিকাভুক্ত করেছেন এবং শব্দগুলিকে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা নির্দেশ করেছেন। আরেকটি আয়াত দেখুন ঃ

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

অতএব তার উপমা কুকুরের উপমার মত.........যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা গণ্য করে তাদের উপমা এমন। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ১৭৬)

কুরআন মজীদে কুকুর শব্দটি আছে ৫বার আর ক্বাওমিল্লযীনা কাযযাবু বি আয়াতিনা এই শব্দমালাও আছে ৫ বার।

কুরআন মজীদে কাফেরদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

﴿قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾

তারা বলে রিবা (সুদ) তো বেচাকেনার মত। (সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ২৭৫)
সুদখোরদের ঐ বক্তব্যকে খণ্ডন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

বরং আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং রিবাকে হারাম করেছেন। (সূরা বাক্বারাহ ২ : ২৭৫)

কুরআনে রিবা ও বাই' (বেচাকেনা) শব্দ দুটিকেও ব্যবহার করা হয়েছে অসম সংখ্যায়। রিবা শব্দটি ربوا রা+বা+ওয়াও+আলিফ বানানে আছে ৫ বার এবং ربا রা+বা+আলিফ বানানে ১ বার; মোট (৫+১=৬) বার। আর বাইউন শব্দটি কুরআনে আছে ৭ বার।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

﴿قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾

"তুমি বল, খবীছ ও তায়্যিব সমান নয়।" (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ১০০)

খবীছ বস্তু বা বিষয় তায়্যিব বস্তু বা বিষয়ের সাথে অবশ্যই তুলনীয় নয়। এখন আমরা কুরআনে খবীছ ও তয়্যিব দশব্দদ্বয়কে গণনা করলে উভয়টি ৭ বার করে পাই। আমরা উপরের আলোচনার আলোকে আশা করতে পারি যে শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় ব্যবহৃত হবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ কি? মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"তুমি বল, খবীছ ও তয়্যিব সমান নয়। যদিও খবীছের আধিক্য তোমার কাছে আজব মনে হয়। অতএব হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ১০০)

এখানে জটিলতার সমাধান দেওয়া হয়েছে। খবীছের আধিক্য মানুষকে তাজ্জব করে দেবে। কিন্তু যারা বোধশক্তিসম্পন্ন তারা জানে সমস্ত খবীছ বর্জনীয়। অতএব খবীছ শব্দটি সাতবার উল্লেখ করা হলেও আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে মাত্র একবার গণনা করব।

আব্দুল আহাদ উমর (গ্যারি মিলার) বলেন,

somebody said: "How do we know we still have the original Quran. May be pieces of it have been lost or extra parts been added?" I pointed out to him that we had pretty well

covered that point because since thess items, the perfect balance of words in the Quran, have come to light only in this generation, anybody who would be lost the portion of this book, hidden some of it, or added some of their own would have been aware of this carefully hidden code in the book. They would have destroyed this perfect balance.

অর্থ কেউ একজন বলেছিল ঃ "কিভাবে আমরা জানব যে আমাদের কাছে আসল কুরআন আছে? সম্ভবত এর কিছু অংশ হারিয়ে গেছে, অথবা অতিরিক্ত অংশ এর সাথে যোগ করা হয়েছে?" আমি তাকে বললাম যে, আমরা এ বিষয়টিকে ভালোভাবে আলোচনা করেছি। কারণ এই আইটেম অর্থাৎ কুরআনের perfect balance of words সম্প্রতি এই প্রজন্মের নজরে এসেছে।

অতীতে কেউ কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে ফেললে, গোপন করলে অথবা অতিরিক্ত অংশ যোগ করলে তারা এই সযত্নে লুকায়িত কোড সম্পর্কে না জানার কারণে এই perfect balance নষ্ট করে ফেলত। (অর্থাৎ বাস্তবে এই শব্দের তারসাম্য অক্ষুন্ন থাকাই প্রমাণ করেছে আসল কুরআনে কোন হেরফের ঘটে নি)

[The Basis of Muslim Belief, Gary Miller, Singpore, 2000]

মানুষের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কুরআনের বিবরণ ঃ

মানুষের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ঘুমের প্রয়োজন অপরিসীম।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾

আর তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে লেবাস বানিয়েছেন এবং ঘুমকে করেছেন বিশ্রাম এবং দিবসকে করেছেন জাগরণের সময়।

(সূরা আল-ফুরক্বান ২৫ ঃ ৪৭)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾

আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম এবং রাত্রিকে করেছি লেবাস এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। (সূরা আন-নাবা ৭৮ ঃ ৯-১১)

ঘুম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ভয় দূর করে। চিকিৎসকগণ তাই উদ্বিগ্ন ও ভীত রোগীদেরকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে থাকেন। কুরআনে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾

তখন তিনি তার তরফ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ১১)

আয়াতটি বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময়ে ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়। এতে তাদের উদ্বেগ ও ভীতি দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফে ভয় দেখানোর দুইটি রীতি দেখা যায়।

(এক) আল্লাহর নিজ সত্তার ভয় দেখানো,

(দুই) তাঁর আযাবের ভয় দেখানো। আযাবের ভয় সকল মানুষই করে। কিন্তু যারা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ও বিশ্বাসী তারা আল্লাহকেই ভয় করে। কুরআনে আমরা দেখি যে নবী, রাসূল, ঈমানদার এবং আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ তাঁর নিজ সত্ত্বার ভয় দেখিয়েছেন। যেমন-

﴿يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। (সূরা আয-যুমার ৩৯ ঃ ১০)

﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

(হে বনু ইসরাঈল!) তোমরা আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাক্বারাহ২ ঃ ৪০)

﴿وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾

তোমরা আমাকেই ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ!

(সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ১৯৭)

অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের ক্ষেত্রে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহর সত্ত্বাকে ভয় করার বিষয়টি উপলব্ধি করতে অক্ষম। যেমন-

﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ﴾

যদি তোমরা তা না কর, আর কখনই তা করতে পারবে না তবে আগুনকে ভয় কর। (সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ২৪)

﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴾

শীঘ্রই তাকে শাস্তির পাহাড়ে চড়াব। (সূরা আল-মুদ্দাচ্ছির ৭৪ ঃ ১৭)

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ﴾

যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে ফুটন্ত পানির পানীয় এবং বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৪)

কুরআনের অনেক বিস্ময়কর দিক আছে যা প্রমাণ করে যে, এটি মহান আল্লাহর রচনা। কুরআনের অনন্য সম্পর্কে আলোচনা করা আমার যোগ্যতা বহির্ভূত। আমি কেবল কিছু তথ্য যোগাড় করেছি যতটুকু মহান আল্লাহ আমাকে তওফীক দিয়েছেন। আমি কামনা করি, এ থেকে মহান আল্লাহ আমাকে এবং সকল পাঠককে ফায়দা দিবেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে কুরআন মজীদ আল্লাহর বাণী।

[মুসলিম ডাইজেস্ট সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর-২০১০]

বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?

বিবর্তনবাদ একটি মতবাদ যাতে মনে করা হয় যে জড় পদার্থ থেকে প্রথমে এককোষী জীব উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নততর জীবের উদ্ভব হয়। বিবর্তনবাদকে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে প্রচার করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে বিবর্তনকে উপস্থাপন বা প্রমাণিত করা হয় নি।

জিওকেমিস্ট Jeffrey Bada বলেন,

"Today as we leave the twentieth century, we still face the biggest unsolvd problem that we had when we entered the twentieth century: How did life originate on earth?"

-Earth Magazine, 1998

অর্থাৎ "বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের সময় সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটি আমাদের ছিল- 'কিভাবে পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল?'- আজ যখন আমরা বিংশ শতাব্দীকে বিদায় জানাচ্ছি তখনও সেই একই অমীমাংসিত প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।"

বিবর্তনবাদের প্রধান প্রস্তাবক চার্লস ডারউইন। তিনি জীববিজ্ঞানের ওপর আগ্রহ সহকারে পড়াশুনা করতেন। তবে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। ১৮৩২ সালে তিনি HMS Beagle নামক জাহাজে ইংল্যান্ড থেকে রওনা হন এবং পাঁচ বছর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এ সফরকালে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী তার চিন্তা ভাবনায় গভীর ছাপ ফেলে। বিশেষ করে ইকুয়েডরের গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কিছু ফ্লিঞ্চ পাখি তাঁকে বিস্মিত করে। তিনি ধারণা করেন যে, আবাসস্থলের সাথে অভিযোজন করতে গিয়েই এদের বিভিন্ন প্রজাতির ঠোঁটের আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়েছে। এই আন্দাজ থেকেই ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ উপস্থাপন করেন, যার সারকথা হল প্রতিটি প্রজাতি আলাদাভাবে সৃষ্টি হয়নি বরং একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে প্রজাতিগুলো নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ডারউইন ১৮৫৯ সালে তাঁর The Origin of Species, By Means of Natural Selection নামক গ্রন্থে এসব মতামত প্রকাশ করেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, সেই সময় জীবের গঠনগত জটিলতা মানুষের জানা ছিল না। সেকালের মানুষ মনে করত, জড়বস্তু থেকে জীবের উৎপত্তি হয়। যেমন- খাদ্যবস্তু ফেলে রাখলে পঁচে খাদ্যদ্রব্য থেকে পোকামাকড় তৈরি হয় বলে তারা মনে করত। নর্দমার ময়লা থেকে মশা মাছির জন্ম বলে তারা মনে করত।

ডারউইনের আগে ল্যামার্ক নামে একজন ফ্রেঞ্চ জীববিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, কোন জীব তার জীবদ্দশায় যেসব দক্ষতা অর্জন করে তার পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে তা লাভ করে। আর ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে বিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ জিরাফের গলা নাকি আগে লম্বা ছিল না। কিন্তু বেশি উচ্চতা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে করতে তাদের গলা লম্বা হয়ে গেছে। ল্যামার্কের এই তত্ত্ব সঠিক নয়। (বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)

ডারউইন দাবি করেছিলেন, তাঁর মতবাদ ল্যামার্কের মতবাদ থেকে ভিন্ন। তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রাকৃতির শক্তির প্রভাবের উপরে। তবুও ডারউইন ল্যামার্কের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রজাতিগুলোর ক্রমাগত উন্নয়ন প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যুক্তি না থাকার কথা ডারউইন নিজেই স্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের "Difficulties of the Theory" অধ্যায়ে এ বিষয় স্বীকার করেছেন। এইসব সমস্যার মধ্যে ছিল ফসিল রেকর্ডে সংযোগস্থাপনকারী প্রজাতির ফসিলের অনুপস্থিতি,অনুন্নত জীবের কিছু জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব (যেমন চোখ)- যা কেবল আকস্মিক সংঘটের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি আশা করেছিলেন যে, নতুন নতুন আবিষ্কার তাঁর মতবাদের সমস্যাগুলো দূর করবে।

ডারউইন বলেন,

"If my theory is true, numberless intermediate varieties, linking most closely all of the species of the same group together must assuredly have existed .... consequently evidence of their former existence could be found only amongst fossil remains".

ডারউইন যা আশা করেছিলেন তা হয়নি। তথাকথিত মধ্যবর্তী প্রজাতির কোন অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। ডারউইনের The Origin of Species গ্রন্থটি পাঁচ বছর পর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার দ্বারা দেখান যে, জড় বস্তু থেকে জীবের উদ্ভব হতে পারে না। একটি কোষ এতই জটিল যে, জড়বস্তু থেকে এর উৎপত্তি অসম্ভব।

ইংরেজ গণিতবিদ ও মহাকাশবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল নিজে একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্বেও বলেছেন,

"The odds that higher life forms might have emerged in this way (through evolution) is comparable to the odds of a tornado sweeping through a junk-yard assembling a Boeing 747 from the materials in it." (Nature magazine, November 12, 1981)

"এই পদ্ধতিতে (বিবর্তনের মাধ্যমে) উন্নত শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনাকে তুলনা করা যায় বিমান নির্মাণ কারখানার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া টর্নেডোর দ্বারা একটা বোয়িং ৭৪৭ বিমান নির্মাণের সম্ভাবনা সাথে।"

জীন ও জীনের গাঠনিক একক ডি. এন. এ আবিষ্কারের পর বিবর্তন মতবাদ গভীরতর সংকটে নিপতিত হয়। গরু যদি তার গলা জিরাফের মত লম্বা করার জন্য কোটি কোটি বছর কসরত করে, তবু তার গলা লম্বা হবে না। এটা করতে হলে গরুর প্রতিটি কোষের জীনের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। শারীরিক কসরতের দ্বারা জীনের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটে না। ফসিল রেকর্ড বিবর্তনবাদকে সমর্থন করে না।

ব্রিটিশ ফসিলবিশেষজ্ঞ Derek Ager বলেন-

"If we examine the fossil record in detail, whether at the level of orders or of species, we find over and over agian-not gradual evolution but the sudden explosion of one group at the expense of another." (The Nature of Fossil Records, Proceedings of the British Geological Association, 1976, vol; 87, P-133)

বিবর্তন মতবাদের ক্রটিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করার পর এবার আমরা কোষ এবং ডি. এন. এ সংশ্লেষণের সম্ভাব্যতা, ফসিল রেকর্ড এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে বিবর্তনবাদীদের বিস্তারিত আলোচনা কর।

বিবর্তনবাদীদের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব আলেকজান্ডার ওপারিন স্বীকার করেছেন

"Unfortunately, the origin of the cell remains a question which is actually the darkest point of the complete evolution theory." (Alexander Oparin, Origin of Life, Dover Publications, New York, 1936, P-196)

পৃথিবীর আদিম অবস্থা ছিল সবচেয়ে বিশৃঙ্খল। সেই পরিবেশে একটা জীবকোষ তো দূরের কথা, কোষ গঠনকারী প্রোটিন এবং নিউক্লেইক এসিড সংশ্লেষণ হওয়া অসম্ভব।

Prof. Leslie Orgel বলেন-

"It is extremely improbable that proteins and nucleic acids, both of which are structurally complex, arose spontaneously in the same place at the same time, yet it also seems impossible to have one without the other. And so at first glance, one might conclude that life could never, in fact, have originated by chemical means." (Scientific American, September, 1994)

একটি জীবকোষে ক্রোমোজোম, নিউক্লিওলাস, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতি অঙ্গাণু একটি কোষ আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। সরলতম কোষে অনেকগুলো অঙ্গাণু না থাকলেও ডি. এন. এ এবং কোষ আবরণী থাকে। মানুষের একটি ডি. এন. এ তে যে পরিমাণ তথ্য থাকে তা লিখতে চারলাখ পঞ্চাশ হাজার পৃষ্ঠার বই রচনা করতে হবে, যে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠার আকৃতি বিশ্বকোষের একটি পৃষ্ঠার অনুরূপ হবে।

কোষের জটিলতা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এর মেমব্রেনগুলোর গঠন ও কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখাই যথেষ্ট। কোষের মেমব্রেন কোষটিকে সুচারুরূপে আবৃত করে রাখে। তবে এর কাজ শুধু এটুকুই নয়। এটি পার্শ্ববর্তী কোষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের মধ্যে বস্তুর প্রবেশ এবং কোষ থেকে বস্তুর বহির্গমনকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে। মেমব্রেন এতই পাতলা যে এর পুরুত্ব এক মিলিমিটারের এক লাখ ভাগের এক ভাগ। কেবল ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচেই এটা সনাক্ত করা সম্ভব।

কোষ মেমব্রেন কেবল ঐসব বস্তুকে প্রবেশ করতে দেয়, যেগুলো কোষের জীবিত থাকার জন্য জরুরি। কোষের বাইরে অগণিত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যেকে আল্লাহর হুকুম তামিল করে যিনি তাদেরকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

"আল্লাহ সাত মহাকাশ এবং সমসংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ নাযিল হয় যাতে তোমরা জানতে পার যে আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে।" (সূরা আত-তালাক, ১২)

যুক্তরাষ্ট্রের Lehigh University এর বায়োকেমিস্ট Michael J. Behe বলেন ঃ

"To Darwin, the cell was a 'black box'- its inner workings were utterly mysterious to him. Now, the black box has been opened up and we know how it works. Applying Darwin's test to the ultra-complex world of molecular machinery and cellular systems that have been discovered over the past 40 years, we can say that Darwin's theory has absolutely broken down."

(Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, 1996)

কোন প্রাণীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সকল তথ্য জমা থাকে জীনে। জেনেটিক পরিবর্তন ছাড়া জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন অসম্ভব। ডারউইনের প্রস্তাব ছিল প্রাকৃতিক শক্তির চাপে পড়ে প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একদল হরিণের মধ্যে কোন বাঘ হামলা করলে যে হরিণ অন্যদের চেয়ে বেশি জোড়ে দৌড়াতে পারবে সে বেঁচে যাবে এটা ঠিক। কিন্তু ঐ হরিণটি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। সেটা হতে হলে হরিণের কোষগুলোতে জীনগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

ডারউইনের পরে কিছু বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী প্রস্তাব রাখেন যে, বাহ্যিক শক্তির আঘাতে ডি. এন. এ-এর গঠন হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এর ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় মিউটেশন (Mutation)। যারা মনে করেন যে, মিউটেশনের মাধ্যমে প্রাণীর পরিবর্তন ঘটেছে তারা নব্য ডারউইনবাদী নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব প্রদানের পর তা প্রমাণের জন্য মিউটেশন নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। সবগুলো পরীক্ষায় দেখা গেছে, মিউটেশনের ফলে প্রজাতির কোন উন্নয়ন হয় না।

Morgan, Goldschmidt, Muller এবং অন্য কয়েকজন জীন গবেষক ড্রসোফিলা (drosophila) মাছির কয়েকটি প্রজন্মকে তীব্র তাপ, শৈত্য, আলোক এবং অন্ধকারে রেখেছেন এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করেছেন। তারা দেখেছেন যে সবগুলো ক্ষেত্রেই মিউটেশনের পর প্রাণীগুলোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়ে গেছে। তারা অনুর্বর হয়েছে, মারা গেছে। প্রাণীগুলোর সবসময় প্রবণতা ছিল আগের রূপে ফিরে যাওয়া। মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মিউটেশনে যদি প্রাণীর উন্নতি সম্ভব না হয় তাহলে প্রকৃতিতে হঠাৎ কোন দূর্ঘটনার ফলে প্রাণীর মিউটেশন থেকে উন্নততর জীবের উদ্ভব হবে এরকম ধারণা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর।

ফসিল রেকর্ড বিবর্তনকে সমর্থন করে না ফসিল বিশেষজ্ঞ Mark Czarnecki বলেন-

"A major problem in proving the theory has been the foss record; the imprints of vanished species in the earth's geological formation. This record has never revealed traces of Darwins hypothetical intermediate variants- instead species appear and disappear abruptly and this anomaly has fueled the creationist argument that cach species was created by God."

(The Revival of the creationist crusade, Maclean's January 19, 1981, P-56)

"মতবাদটি প্রমাণের একটি বড় মুশকিল ফসিল রেকর্ড অর্থাৎ পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক স্তরগুলোতে বিলুপ্ত প্রাণীগুলোর ফেলে যাওয়া চিহ্ন বা দেহাবশেষগুলি। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী অসংখ্য প্রজাতি থাকার যে সম্ভাবনার কথা ডারউইন বলেছিলেন তার কোন ছিটেফোটাও ফসিল রেকর্ডে পাওয়া যায়নি। বরং এক একটি প্রজাতি হঠাৎ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে এবং হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই অস্বাভাবিক ঘটনা সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্বাসীদের যুক্তিকে মজবুত করেছে যে প্রত্যেক প্রজাতি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।"

এক সময়ে সিলাকান্থ নামক একটি প্রাণীকে মাছ ও উভয়চরদের মধ্যবর্তী একটি প্রজাতি বলে বলা হত। আর্কিপটেরিক্স নামক একটি প্রাণীকে উভচর এবং পাখিদের মধ্যবর্তী একটি প্রজাতি বলে প্রচার করা হত। কিন্তু এসব দাবী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ৪১ কোটি বছর আগের সিলাকান্থের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ভারত মহাসাগরে একটি জীবন্ত সিলাকান্থ ধরা পড়ে। দেখা গেল সিলাকান্থ আসলে একটি পূর্ণাঙ্গ মাছ। এই ঘটনায় বিবর্তনবাদীরা ভীষণ ধাক্কা খায়। বিবর্তনবাদী L.B.Smith বলেছিলেন, "একটা জীবন্ত ডাইনোসর হাজির হলেও তিনি এতটা তাজ্জব হবেন না।" (The Hamlyn Encyclopaedia of Prehistoric Animal, New York, 1984, P-120)

পরবর্তীতে বিভিন্ন সাগরে আরো দুইশত সিলাকান্থ মাছ ধরা পড়েছে।

আর্কিপটেরিক্সের প্রথম যে ছয়টি ফসিল পাওয়া যায় সেগুলোতে স্টার্নাম হাড়ের কোন চিহ্ন ছিল না। এ কারণে মনে করা হত এরা পাখির মত দেখালেও উড়তে পারত না। কিন্তু ১৯৯২ সালে আর্কিপটেরিক্সের সপ্তম ফসিলটি পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় যে, আর্কিপটেরিক্সের স্টার্নাম ছিল। অর্থাৎ আর্কিপটেরিক্স ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ পাখি- পাখি ও উভচরের মধ্যবর্তী কোন জন্তু নয়।

বিজ্ঞান পত্রিকা The Nature এর বর্ণনায়,

"The recently discovered seventh specimen of the Arechaepteryx preseves a partical rectangular sturnum suspected but never previosusly documented. This attests to it's strong flight muscles." (The Nature, Vol. 382, Aughst 1. 1996. P-401)

সম্প্রতি আবিষ্কৃত আর্কিপটেরিক্সের সপ্তম ফসিলটিতে স্টার্নাম পাওয়া গেছে যার সম্ভাব্যতা আশা করা হয়েছিল কিন্তু আগের ফসিলগুলোতে পাওয়া যায়নি। এই ফসিলটি প্রমাণ করে যে আর্কিপটেরিক্সের ওড়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী পেশী ছিল।

ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের অর্থাৎ প্রায় ৫৫ কোটি বছর আগের দশটিরও বেশি আলাদা প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন প্রজাতিই তাদের আগে ছিল না। এই প্রাণীগুলো হল শামুক, কেঁচো, স্পঞ্জ, জেলিফিশ, সাগর-সজারু, ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি। ভূতাত্ত্বিক সাহিত্যে এই

আকস্মিক আবির্ভাবকে 'ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশন' বলা হয়ে থাকে। ঐ প্রাণীগুলোর জটিল সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল যা তাদের বর্ত্তমান উত্তরসূরীদের থেকে মোটেও ভিন্ন নয়। ট্রাইলোবাইটের চোখ লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট কণার সমন্বয়ে গঠিত। কণাগুলো মৌচাকের আকৃতিতে সজ্জিত।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর David Raup বলেন,

"The trilobites used an optical design which would require a well trained and imaginative optical engineer to develop today." (Conflicts between Darwin and paleontology, David Raup, Bulletin of Field Museum of Natural History, January 1979, P- 24)

"ট্রাইলোবাইটরা যে ধরনের আলোকযন্ত্র ব্যবহার করত আজকের দিনে প্রস্তুত করতে উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কল্পনাশক্তির অধিকারী আলোক-প্রকৌশলীর দরকার হবে।"

অক্সফোর্ডের প্রাণিবিজ্ঞানী Richard Dawkins বলেন,

"The Cambrian strata of rocks, vintage about six hundred million years, are the oldest ones in which we find most of the major invertebrate group. And we find many of them already in an advanced state of evolution, the very first time they appear. It is though they were just planted there, without any evolutionary history. Needless to say, this appearance of sudden planting has delighted creationists". (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London, 1986, P-229)

"প্রায় ৬০ কোটি বছর আগের ক্যাম্ব্রিয়ান শিলাস্তরে আমরা প্রধান অমেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোকে প্রথম দেখতে পাই। আর আমরা দেখতে পাই যে বিবর্তনের জন্য যে সময় দরকার তার অনেক আগেই তারা উপস্থিত। তাদের প্রথম উপস্থিতিতেই ওটা দেখা যায়। ঘটনাটা যেন এমন যে তাদের কোন বিবর্তনের ইতিহাস নেই, বরং তাদেরকে কেউ রোপন করে রেখে গেছে। বলাই বাহুল্য যে এরকম হঠাৎ রোপনের ঘটনা সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীদেরকে আনন্দিত করেছে।"

এমন অসংখ্য প্রাণী আছে যারা কোটি কোটি বছর আগে ছিল, এখনও আছে। আর এদের কোন পরিবর্তনও ঘটেনি। চার কোটি বছর আগের ফড়িং, পাঁচ কোটি বছর আগের পিঁপড়া, দশ কোটি বছর আগের সামুদ্রিক

কচ্ছপ, বত্রিশ কোটি বছর আগের তেলাপোকা এবং চল্লিশ কোটি বছর আগের হাঙ্গরের ফসিল পাওয়া গেছে। এরা এদের বর্তমান উত্তরসূরীদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না।

বিবর্তনবাদীরা বলে থাকেন যে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে এপ (ape বানর জাতীয় জন্তু) থেকে। এপরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, চলাচলের জন্য তাদেরকে চারটি পা ব্যবহার করতে হয়। মানুষের বুদ্ধির সাথে এপদের বুদ্ধির কোন তুলনাই করা যায় না। বিবর্তনবাদীদের মতে বিবর্তনের ধারাটি হচ্ছে ঃ এপ>অস্ট্রালোপিথেকাস> হোমোহাবিলিস> হোমো ইরেক্টাস> নিয়ানডারথাল মানুষ> ক্রো- ম্যাগনন মানুষ> আধুনিক মানুষ।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু ফসিলকে অস্ট্রালোপিথেকাসের ফসিল বলে দাবি করা হত। বলা হত যে এপদের চেয়ে অস্ট্রালোপিথেকাসেরা উন্নততর ছিল। তারা ছিল প্রথম প্রাণী যারা চার পায়ের বদলে দুই পায়ে চলত। তবে অস্ট্রালোপিথেকাসরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।

বিবর্তনবাদীদের এসব দাবী মিথ্যা প্রামাণিত হয়েছে। ব্রিটিশ ফসিল বিশেষজ্ঞ Robin Crompton হাঁটাহাঁটি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, এ ধরণের চলাফেরা বাস্তবসম্মত নয়। কোন প্রাণী হয় সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটবে অথবা চার পায়ে হাঁটবে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না যে প্রাণী সে চলার জন্য চার পা ব্যবহার করবে। কারণ দুই পায়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটলে প্রচুর শক্তি খরচ হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্ররা জানে যে, কোন প্রাণী তার অবস্থান নির্ণয় এবং ভারসাম্য রক্ষা করে কানের মাধ্যমে। কানের ভেতরে এক ধরনের পদার্থ থাকে যার কারণে আমরা চোখ বন্ধ করেও বুঝতে পারি আমরা দাঁড়িয়ে আছি, নাকি শুয়ে আছি, নাকি পা দুটি তমালের ডালে বেঁধে শরীরটাকে ঝুলিয়ে রাখা আছে।

লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের Human Anatomy and Cellular Biology বিভাগের গবেষক Fred Spoor ১৯৯৪ সালে জানান যে, দুই পায়ে হাঁটতে হলে কানের ককলিয়া (cochlea) এর গঠন যেমন হওয়া দরকার, অস্ট্রালোপিথেকাসদের ককলিয়া তেমনটি ছিল না। ফলে এটা এখন স্বীকৃত যে অস্ট্রালোপিথেকাসরা চার পায়েই হাঁটত।

হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস প্রভৃতি একই সময়ে পৃথিবরি বিভিন্ন জায়গায় বাস করত। এদের একটি অন্যটির পূর্বপুরুষ নয়। এরা মানুষেরই বিলুপ্ত জাতি বা উপজাতি। আধুনিক মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে ছিল। বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানী Arthur Keith প্রাচীন এই তথাকথিত প্রজাতিগুলো নিয়ে তাঁর গবেষণার ফলাফল ১৯১১ সালে Ancient Types of Man নামক একটি গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন যে, মানুষের বিলুপ্ত রূপভেদগুলি যত প্রাচীন, আধুনিক মানুষও ততটাই প্রাচীন। এরা একই সময় থেকে পৃথিবীতে আছে।

The New Scientist পত্রিকার ১৯৯৮ সংখ্যায় একটি খবর প্রকাশিত হয় ঃ

"Early humans were much smarter than we suspected. Our ancestors made organised sea journeys more than seven hundred thousand years earliar than previously thought and they probably used language to co-ordinate their efforts. This surprising new theory comes from paleontologist Mike Morwood and his colleagues at the University of New England in Northern New South Wales."

এই প্রাচীন সমুদ্র যাত্রীরাই হোমো ইরেক্টাস নামে অভিহিত। ২৬ হাজার বছর আগের ফসিলে সূচ পাওয়া গেছে যা প্রমাণ করে যে, নিয়ানডারথাল মানুষরা পোশাক তৈরি করত। তারা মৃতদেরকে কবর দিত। নিয়ানডারথালরা মানুষেরই একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্র।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত খবরে বলা হয়,

"Clive Finlayson at the Gibraltar Museum, and collegues, recovered 240 stone tools and artefacts from sediments dated to the upper paleolithic periodbetween ten thousand and thirty thousand years ago. Mass spectrometry dating puts them between twenty-eight thousand and twenty four thousand years old. (New Scientist, 13 Sept. 2006)

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী Erik Trinkausবলেন

Nianderthal anatomy conclusively inicates locomotor, manipulative, intellectual or linga abilities inferior to those of modarn humans. (Hard Time among the Neanderthals, Natural History, December 1978, Page 10)

"নিয়ানডোরখালদের দেহগঠনে এমন কিছুই নেই যা নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করতে পারে যে, আধুনিক মানুষের চেয়ে তাদের চলাফেরা, কাজকর্ম, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভাষাগত দক্ষতা কম ছিল।"

আধুনিক মানুষ ও তথাকথিত হোমো ইরেক্টাসদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ফসিল বিশেষজ্ঞ Richard Leaky বলেন-

These differences are probably no more pronounced than we see today between the separate geographical races of modern humps. (Making of Mankind, 1981, P-62)

"এইসব পার্থক্য সম্ভবত বেশি নয় ঐসব পার্থক্যের চেয়ে যা আমরা আজকের দিনে আধুনিক মানুষের পৃথক ভৌগলিক বর্ণগোত্রগুলোর মধ্যে দেখি।"

দুঃখের বিষয় হল, প্রাচীনকালের মানুষের মাথার খুলি পাওয়ার পর তাদের যেসব চেহারা বিবর্তনবাদীরা এঁকেছে, সেগুলোতে তাদেরকে বানরের চেহারা দিয়েছে।

একই খুলির ভিত্তিতে ৪ এপ্রিল, ১৯৬৪ তারিখের Sunday Times সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ এর National Geographic পত্রিকা দুটি ছবি প্রকাশ করে। খুলি একই হলেও দুটি পত্রিকায় প্রদত্ত অঙ্কিত ছবি দুটির মধ্যে কোন মিল নেই। একটি ছবিতে প্রাণীটিকে বানরের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। অন্য ছবিতে তা মানুষের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Earnst Hooten বলেন,

"To attempt ot restore the soft parts is even more hazardous undertaking. The lips, the eyes, the ears & the nasal tip leave no clues as to the underlying bony parts. You can with equal facility model on a Neanderthal skull the features of a chimpanzee of the lineaments of a philosopher. These restoration of ancient types of man have very little, if any, scientific value and are likely only to mislead the public .... So put not your trust in reconstructions." (Up from the Ape, New Yourk. 1931, P-332)

দেহের মোলায়েম অংশকে মূলের আদলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আরো বড় ঝুঁকিদার কাজ। ঠোঁটে, চোখ, কান এবং নাকের ডগা তাদের নিচে অবস্থিত হাড়ের সম্পর্কে কোন যোগসূত্র রেখে যায় না। একটি নিয়ানডারথাল খুলির উপর আপনি সমান সহজসাধ্যতায় একটি শিম্পাঞ্জীর মুখের আদল বানাতে পারেন, আবার একজন দার্শনিকের বৈশিষ্টসূচক মুখাবয়ব ও বানাতে পারেন। আদিম মানুষের খুলি থেকে চেহারা ফিরিয়ে আনার এই কাজের যদি বৈজ্ঞানিক কোন মূল্য থেকে থাকে তবু তা সামান্যই আর এসব কাজ কেবল মানুষকে ভুল ধারণা দিতে পারে। .... সুতরাং পুনগঠিত ছবি বা মূর্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।"

১৯২২ সালে American Museum of Natural History এর ম্যানেজার H.F.Osborn ঘোষণা করেন যে, তিনি নেব্রাস্কায় একটি দাঁতের ফসিল পেয়েছেন যার মধ্যে মানুষ ও এপ উভয়ের দাঁতের কিছু কিছু মিল আছে। এই একটি দাঁতের উপর ভিত্তি করে London News পত্রিকার ২৪ জুলাই ১৯২২ সংখ্যায় একরকম বান-মানুষের ছবি ছাপা হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল নেব্রাস্কা ম্যান। ১৯২৭ সালে এই কঙ্কালের অন্য অংশগুলোর ফসিলও পাওয়া গেল। তখন দেখা গেল যে, এই দাঁতটি কোন বানরের নয়, মানুষের নয়, দাঁতটি একটি বিলুপ্ত খিনজিরের।

বিজ্ঞান সাময়িকী Nature এর সিনিয়র এডিটর Henry বলেন-

"The very idea of the missing link, always shaky, is now completely untenable.". (The Guardian, 11 July, 2002)

অর্থাৎ "হারানো সূত্রের ধারণাটা সবসময়ই নড়বড়ে ছিল এখন দেখা যাচ্ছে সমর্থনের পুরোপুরি অযোগ্য।"

যুক্তরাষ্ট্রের জীববিজ্ঞানী Jonathan Wells বলেন-

"The general public is rarely informed of the deep-seated uncertainty about human origins that is reflected in these statements by scientific experts. Instead, we are simply fed the latest version of somebody's theory, without being told that paleonthropoligists themselves cannot agree over it. And typically, the theory is illustrated with fanciful drawings of cavemen or human actors wearing heavy makeup." (Icons of Evolution. Science or Myth. Washington D.C. 2000, P-225)

অর্থাৎ "বিজ্ঞান এক্সপার্টদের বক্তব্যে প্রতিফলিত মানুষের উৎপত্তিতত্ত্ব সম্পর্কিত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অনিশ্চয়তা সম্পর্কে সাধারণ লোকদেরকে খুব কম ক্ষেত্রে অবহিত করা হয়। বরং কোন এক ব্যক্তির তত্ত্বের সর্বশেষ ভাষ্য পরিবেশন করা হয় অথচ এটা বলা হয় না যে প্রাচীন মানব বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন না। আর সাধারণত গুহাবাসী মানুষের কাল্পনিক ছবি অথবা হেভি মেকআপ নেয়া অভিনেতাদের অভিনয়ের মাধ্যমে তত্ত্বটি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।"

এতকিছুর পরেও বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনবাদ ত্যাগ করতে নারাজ। এর কারণ কি? এর কারণ, তারা কোন অবস্থাতেই স্রষ্টাকে বিশ্বাস করবে না, স্রষ্টাকে বিশ্বাস না করাটাই তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম। তাদের বিশ্বাসের সাথে যে মতবাদ সংগতিপূর্ণ কেবল তাই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, সে মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও।

বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানী Arthur Keith স্বীকার করেছেন-

"Evolution is unproved and unprovable. We believe it because the only alternative is special creation which is unthinkable." (Introduction to Origin of Species, 1959)

অর্থাৎ "বিবর্তন প্রমাণিত হয়নি, প্রমাণ করাও যাবে না। আমরা এটা বিশ্বাস করি কারণ এর একমাত্র বিপরীত মতবাদ সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্টি মতবাদ যেটা আমরা ভাবতেই পারি না।"

বিবর্তনবাদ কোন বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ নয়। এটি একটি কুসংস্কার। সত্য কথা হল বিশ্বজগতের সমস্ত জড় ও জীবকে সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

[মাসিক আল-মাদানী, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৪]

আদিম ও অন্তিম ধর্ম ইসলাম

কোন কোন বুদ্ধিজীবী ইসলাম ধর্মকে 'মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম' হিসাবে বর্ণনা করে থাকেন যা সঠিক নয়। অনুরূপভাবে এমন বলা হয় যে, ইহুদী ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম ইসলাম ধর্মের চেয়ে পুরাতন ধর্ম। এই ধারণা বস্তুনিষ্ঠ নয়। ইহুদী ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের আগেই ইসলাম ছিল। পহেলা মানুষ আদম عليه السلام থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী এবং তাঁদের সত্যিকারের অনুসারীদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েই মানুষ বিভিন্ন ধর্ম তৈরি করেছে।

সকল নবীর ঈমান ছিল এক ও অভিন্ন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"হর উম্মতের মধ্যে নবী রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে আল্লাহর ইবাদত কর এবং মিথ্যা উপাস্যসমূহকে বর্জন কর।

(সূরা আন-নাহল ১৬ : ৩৬)

আল্লাহর ইবাদতের মাকসাদে আদম عليه السلام ই ধরণীতে পহেলা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা কা'বা শরীফ নামে পরিচিত। ইবরাহীম عليه السلام সেই মসজিদটিকেই পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।পরবর্তীকালে মসজিদটিতে মূর্তিপূজা চালু হয়েছিল। আর আখেরী নবী মুহাম্মদ ﷺ মসজিদটিকে মূর্তিমুক্ত করেছেন।

সকল নবী তাওহীদের দাওয়াতে মশগুল থেকে তাঁদের হায়াত গুজরান করেছেন। আর তাঁরা নিজেদেরকে মুসলিম বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

কুরআন পড়ে আমরা জানতে পারি, নূহ عليه السلام তাঁর কওমকে বলেছিলেন,

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি মুসলিমদের মধ্যে শামিল থাকি।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৭২)

নূহ ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন,

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾

"হে আমার পালনকর্তা! মাফ করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে আর যারা ঈমানদার অবস্থায় আমার ঘরে দাখিল হয় তাদেরকে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীগণকেও। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছুই বাড়ায়েন না। (সূরা নূহ ৭১ ঃ ২৮)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, নাসারাও ছিল না। লেকিন সে ছিল হানীফ (সত্যাশ্রয়ী) মুসলিম।" (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৬৭)

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (কা'বা) ঘরের ভিত্তি স্থাপন (পুনর্নির্মাণের) করার সময় দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আপনার জন্য দু'জন মুসলিম করুন আর আমাদের বংশধর থেকে আপনার জন্য মুসলিম উম্মত করুন। (সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ১২৭-১২৮)

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

" তোমরা কি তখন সাক্ষী ছিলে যখন ইয়াকুবের কাছে মওত হাযির হয়েছিল? তখন তিনি তার পুত্রগণকে বলেছিলেন, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্যের, আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব। তিনিই একমাত্র উপাস্য, আমরা তার জন্য মুসলিম।"

(সূরা বাক্বরাহ ২ ঃ ১৩৩)

ইউসুফ عليه السلام দোয়া করেছিলেন ঃ

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾

"হে আসমানসমূহ ও ধরণীয় পয়দাকারী। আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ওলী আমাকে মুসলিমরূপে পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করে নিন এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে আমাকে শামিল করুন।"

(সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০১)

﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾

মূসা তাঁর কওমকে বলেছিলঃ "হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক তবে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করে যদি তোমরা মুসলিম হও।" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৮৪)

সাদুমে লুত عليه السلام-এর পরিবারই ছিল একমাত্র মুসলিম পরিবার। মহান আল্লাহবলেন,

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"যেখানে একটি পরিবার [লুত (আ:)-এর পরিবার] ছাড়া মুসলিমদের মধ্যে শামিল কাউকে পাইনি।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১ ঃ ৩৬)

ঈসা ﷺ বলেছিলেন ঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা, তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব তাঁরই ইবাদত কর।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫১)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"যখন ঈসা তাদের কুফরি উপলব্ধি করল, সে বলল, "আল্লাহর পথে কারা আমার আনসার?" শিষ্যরা বলল, "আমরা আল্লাহর (পথে) আনসার। আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং শাহাদত নিন যে আমরা মুসলিম।" (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫২)

মুহাম্মদ ﷺ পূর্ববর্তী নবীদের মত একই দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন এবং নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"তুমি বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে তাঁর জন্য ধর্মকে ইখলাসপূর্ণ রাখতে। আর আদিষ্ট হয়েছি যে আমি মুসলিমদের অগ্রণী হই।" (সূরা আয-যুমার ৩৯ ঃ ১১-১২)

নবীদের মধ্যে ঈমানগত কোন ফারাক ছিল না। কিন্তু ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা ও সামাজিক বাধা-নিষেধে কিছু এখতেলাফ ছিল। নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয। পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতের উপর দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয ছিল। আমাদের উপর সিয়াম ফরয পূরা রামাযান মাস। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপরেও সিয়াম ফরয ছিল তবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আদম ﷺ-এর সন্তানদের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইবোনের মধ্যে নিকাহের নির্দেশ ছিল। কিন্তু পরবর্তী নবীদের উম্মতের জন্য সহোদর ভাইবোনের মধ্যে নিকাহ নিষিদ্ধ।

ইয়াকুব ﷵ-এর পূর্ববর্তী নবীগণ উটের গোশত খেতেন। ইয়াকুব ﷵ নিজে উটের গোশত খেতেন না। এ কারণে বনু ইসরাইল উটের গোশত খেত না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইসরাইল (অর্থাৎ ইয়াকুব) নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনু ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্য হালাল ছিল। তুমি বল, 'তাওরাত আন এবং তেলাওয়াত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৯৩)

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

"যারা ইহুদী হয়েছিল তাদের জন্য নখরযুক্ত সকল পশু হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, তবে এগুলির পিঠের অথবা অস্ত্রের অথবা হাড়সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত তাদের অবাধ্যতার দরুন তাদেরকে এই জাযা দিয়েছিলেন।"

(সূরা আনআম ৬ ঃ ১৪৬)

বনু ইসরাঈলের জন্য যেসব বস্তু হারাম ছিল সেগুলির মধ্যে কতকগুলিকে ঈসা ﷵ-এর মাধ্যমে হালাল করা হয়।

ঈসা ﷵ বলেনঃ

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

'তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কতকগুলিকে হালাল করার জন্য [আমাকে পাঠানো হয়েছে]। (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫০)

মূসা ﷺ-এর পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে 'বিশ্রামবার' (Sabbath) পালনের নির্দেশ ছিল না। মূসা ﷺ-এর সময়ে বনী ইসরাঈলকে বিশ্রামবার পালনের আদেশ দেয়া হয়।

সকল নবী ছিলেন মুসলিম। তাঁদের সত্যিকারের অনুসারীরাও ছিলেন মুসলিম। মূসা ﷺ-এর সত্যিকারের অনুসারীরা ইহুদী নয় বরং যারা মূসা ﷺএর শিক্ষাকে বিকৃত করেছিল তারাই ইহুদী। ঈসা ﷺ-এর সত্যিকারের অনুসারীরা খ্রিস্টান নন, বরং যারা ঈসা ﷺ-এর সত্যিকারের অনুসারীরা খ্রিস্টান নন, বরং যারা ঈসা ﷺ-এর শেখানো তাওহীদ ভুলে ঈসা ﷺকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে তারাই খ্রিস্টান।

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

সত্যই আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ১৯)

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসরণ করলে কখনই তার কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে খেসারতে পতিতদের মধ্যে শামিল হবে। (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৮৫)

মানুষের মত জিন্নদের জন্যও মনোনীত ধর্ম ইসলাম।

জীন্নদের ভাষায় ঃ

﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾

আমাদের মধ্যে কতক মুসলিম আর আমাদের মধ্যে কতক অবিচারকারী। (সূরা আল-জীন ৭২ ঃ ১৪)

নবীরা একই উৎস থেকে ওহী লাভ করতেন এবং একই বার্তা মানুষকে পৌছে দিতেন। তবে শরীয়তে কিছু ভিন্নতা এসেছে। আর দতহযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীয়তের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়ত রদ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সর্বশেষ শরীয়ত যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

[মুসলিম ডাইজেস্ট, জুন-২০১০]

শিরকের উৎপত্তি, বিস্তার ও শিরক থেকে মুক্তিলাভ

সের্ফ একজন ইলাহ বা উপাস্যে বিশ্বাস করার মতবাদকে বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ। এক উপাস্যের সাথে আরো উপাস্য সাব্যস্ত করাকে বলা হয় শিরক বা অংশীবাদ বা বহু-ঈশ্বরবাদ। সত্য কথা হল, ইলাহ বা উপাস্য একজনই। একাধিক উপাস্য থাকলে আসমানসমূহ ও ধরণীতে কোন নিয়ম, ছন্দ বা সুব্যবস্থা রক্ষিত হত না।

কুরআনে আমরা পড়ি ঃ

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

"যদি (আসমানসমূহ ও ধরণী) এ উভয়ের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত আরো উপাস্যসমূহ থাকত, তাহলে এ উভয়ের মধ্যে ফ্যাছাদ লেগে থাকত।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১ ঃ ২২)

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

"তিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ নির্মাণ করেছেন। তোমরা তা দেখছ। তিনিই ধরনীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। আর তিনি এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন হরেক জীবজন্তু। আর আমিই আসমান থেকে পানি নাযিল করি এরপর এতে উদগত করি সবরকম কল্যাণকর প্রজাতি। এটা আল্লাহর তৈরী। এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া অন্যরা কী পয়দা করেছে।" (সূরা লুক্বমান ৩১ ঃ ১০-১১)

কুরআনের ১১২ নং সূরার নাম সূরা তাওহীদ বা সূরা ইখলাস। সত্যিকারের উপাস্যের কি কি গুণ থাকতে হবে তা বলা হয়েছে এই সূরাতে।

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বল ঃ তিনি আল্লাহ, একক সত্ত্বা। তিনি কারো পিতা হন না, কেউ তার পিতা হয় না। এবং তাঁর কুফু একজনও নেই।" (সূরা ইখলাস ১১২ ঃ ১-৪)

অতএব যেসব সত্ত্বার খাদ্য, পানীয়সহ বিভিন্ন চাহিদা আছে, পত্নী বা স্বামী, পিতা বা মাতা এবং পুত্র বা কন্যা আছে এবং তার সাথে মোকাবেলা করতে পারে এমন সত্ত্বাও থাকে, সেসব সত্ত্বা ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না।

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾

"আল্লাহর পরিবর্তে যাদের কাছে তোমরা দোয়া কর তারা ত একটা খেজুরের খোসারও মালিক নয়।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ১৩)

মানুষের দুশমন ইবলীছই শিরক শিখায়

মহান আল্লাহ আদম ﷺ-কে পয়দা করে ইবলীছসহ ফেরেশতাগণকে আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করতে। ইবলীছ অস্বীকার করলে তাকে তিনি তাঁর দরবার থেকে বের করে দিলেন। ইবলীছ তখন আরয করল,

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

"পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭ ঃ ১৪)

আল্লাহ তাকে অবকাশ দিলেন। এরপর-

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۞ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

"সে বলল ঃ আপনি আমাকে যে শাস্তি দিলেন তার দরুন আমি সরলপথে ওদের জন্য ওঁত পেতে থাকব। এরপর আমি তাদের কাছে আসবই তাদের সামনে ও পিছন থেকে, এবং তাদের ডান পাশ ও তাদের বাম পাশ থেকে। আর আপনি তাদের আকছারকে শুকুরিয়া গুজার পাবেন না। তিনি বলেন : এখান থেকে খারিজ হও ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

তাদের মধ্যে যারা তোমাকে এত্তেবা করবে আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে দেব । (সূরা আল-আ'রাফ ৭ঃ ১৬-১৮)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ ওদ্দা, ছুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াইক্ব ও নাছরা সম্পর্কে বলেন, "এরা ছিলেন নূহ (আ:)-এর কওমের সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। যখন তারা হালাক হলেন শয়তান তাদের কওমের লোকদেরকে ওহী করল ঃ তারা যেখানে বসতেন সেখানে তাদের মূর্তি বানিয়ে রাখ আর তাদের নামকরণ কর। তারা সেটা করল যদিও তারা তখন তাদের ইবাদত করত না। এরপর যখন এই লোকেরাও হালাক হল, তখন এই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে গেল। (বুখারী)

নূহ عليه السلام যখন তাঁর কওমকে শিরক ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বলল:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾

"আমরা তো আমাদের বাপদাদাদের মধ্যে একথা শুনি নি।"
(সূরা আল-মুমিনুন ২৩ ঃ ২৪)

মিশরে এসময় সূর্য, চাঁদসহ বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা চালু হয়। আর মিশরের রাজা ফিরাউনও নিজকে উপাস্য বা পূজনীয় বলে দাবি করত।

মূসা عليه السلام ফিরাউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াত দিলে এবং আয়াতসমূহ দেখালে সে অস্বীকার করে। এরপর সে লোকদেরকে সমবেত করে এলান করে

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾

"আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা।" (সূরা আন-নাযিআত ৭৯ ঃ ২৪)

এমনকি হযরত মূসা عليه السلام কে এও বলে,

﴿قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾

"তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্য হিছাবে নাও, আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।" (সূরা আশ-শুয়ারা ২৬ ঃ ২৯)

এভাবে যুগে যুগে অনেক মানুষ নিজেদেরকেই উপাস্য বলে দাবি করেছে।

আল্লাহ বনুইসরাঈলকে ফিরাউনের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর রহমতকে ভুলে প্রতিবেশী মূর্তিপূজক জাতির ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

বনু ইসরাইলকে সাগর পার করালাম। এরপর তারা একটি কওমের কাছে এল, তারা তাদের মূর্তিগুলোর কাছে উকুফ করত। তারা বলল, 'হে মূসা! আমাদের জন্য দেবতা বানিয়ে দাও যেমন দেবতা তাদের আছে।' সে বলল, 'তোমরা একটা জাহেল কওম। অবশ্যই এরা যাতে লিপ্ত তা বিধ্বস্ত হবে। আর তারা যা আমল করে তা বাতিল।

(সূরা আল-আ'রাফ ৭ ঃ ১৩৮-১৩৯)

এরপরে আল্লাহর আদেশ মতে মূসা ﷺ তূর-এ ইতিকাফ করতে যান যার পরে তাকে তাওরাতের লওহ সমূহ দেয়া হয়। এই ফুরসতে বনী ইসরাইলের লোকেরা বাছুরের মূর্তি বানিয়ে পূজা শুরু করে। বিস্তারিত দেখুন সূরা ত্বা-হা ৮৩-৯৭ আয়াত।

হাদীসে এমন এক জাতির কথা জানা যায় যারা তাঁদের এলাকা অতিক্রমকারী লোকদেরকে বাধ্য করত তাদের মূর্তির জন্য কুরবানী করতে।

রাসূল ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি একটি মাছির জন্য জান্নাতে দাখিল হল আর অন্য এক ব্যক্তি একটি মাছির জন্য আগুনে দাখিল হল। সাহাবাগণ বললেন, "এটা কিভাবে হল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ?" তিনি বলরেন, দুই ব্যক্তি একটি কওমের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল যাদের ছিল একটি মূর্তি। তারা দুই ব্যক্তির একজনকে বলল, "কুরবানী কর।" সে বলল, "আমার কাছে কিছু নেই যে কুরবানী করব।" তারা তাকে বলল, "কুরবানী কর একটা মাছি হলেও।" সে একটা মাছি কুরবানী করল, তার জন্য তারা

পথ খুলে দিল। ফলে সে আগুনে দাখিল হল। তারা অন্য লোকটিকে বলল, "কুরবানী কর।" সে বলল, "আমি তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কুরবানী করি না।" তারা তার গর্দানে আঘাত করল। ফলে সে জান্নাতে দাখিল হল। (আহমদ)

লেবাননে এক সময় ফিনিশীয় জাতি বাস করত, তারা বা'ল নামক মূর্তি পূজায় লিপ্ত হলে আল্লাহ ইলিয়াছ عليه السلامকে তাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾

ইলিয়াছ রাসূলদের মধ্যে একজন ছিল। একদা সে তার কওমকে বলেছিল, "তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'আলের কাছে দোয়া করবে এবং পরিত্যাগ করবে নির্মাতাদের সেরাকে? আল্লাহকে, [যিনি] পালনকর্তা তোমাদের এবং পালনকর্তা তোমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদের?" এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। অতএব অবশ্যই তারা হবে (আযাবের জন্য) হাযির করা লোকজন। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭ঃ১২৩-১২৭)

ঈসা عليه السلام [যাকে যীশু খ্রিস্টও বলা হয়] আল্লাহর একজন বান্দা ও নবী ছিলেন। তিনি মানুষকে দাওয়াত দিতেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। অথচ পরবর্তীকালে একদল মানুষ ভুল বুঝে ঈসা عليه السلام কে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে।

আল্লাহ বিশ্ববাসীকে তাঁর অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যে ঈসা عليه السلام কে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা ছাড়া। তাঁর আম্মা মরিয়াম عليها السلام ছিলেন সচ্চরিত্রা ও সিদ্দীকা। কুমারী হয়েও তিনি সন্তান লাভ করেন আল্লাহর হুকুমে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"যখন তিনি (আল্লাহ) কোন বিষয়ে ডিক্রী করেন তাকে বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা মারয়াম ১৯ঃ৩৫)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন ঈসা ﷺ কে ক্ষমতা দেন অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দেয়ার, কু'রোগীকে আরোগ্য দেয়ার এবং মৃতকে হায়াত দেয়ার।

ঈসা ﷺ-এর দাওয়াত ছিল ঃ

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾

"তোমরা আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহর ইবাদত কর।" (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ১১৭)

যারা আল্লাহর অবাধ্য ছিল তাদের ওপর তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾

"বনু ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা অভিশপ্ত হয়েছিল দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার ভাষায়।" (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৭৮)

ইসরাইলীদের অনেকেই ঈসা ﷺ-এর বিরোধিতা করে। এমন কি তারা রোমান শাসকের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ কৌশলে তাকে তুলে নেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঈসা ﷺ তাঁর সাথীদের মধ্যে সকলের থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পান নি।

কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

"যখন ঈসা তাদের কুফরী উপলব্ধি করল তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার আনসার?' হাওয়ারীগণ বলল, 'আমরা আল্লাহর পথে আনসার। আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি। আপনি শাহাদত নিন যে আমরা মুসলিম।' (সূরা আলে-ইমরান ৩ ঃ ৫২)

ঈসা ﷺ এর উর্ধ্বগমনের পর লোকেরা নানা মতে বিভক্ত হয়ে যায়। এদেরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) Psilanthropist ও (২) Trinitarian.

Psilanthropist তারা, যারা মনে করে ঈসা ﷺ একজন মানুষ ও নবী। তারা তাওহীদে বিশ্বাসী। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি মাযহাব আছে যথা Ebionites, Socinians ইত্যাদি।

Trinitarian (ত্রিত্ববাদী): তারা যারা তিনজন উপাস্যে বিশ্বাস করত। এদের মধ্যে অনেকগুলি মাযহাব ও উপ-মাযহাব আছে। যেমন Catholic, Protestant, Orthodox, Armenian Church, Mariamites ইত্যাদি। তারা সবাই আসলে শিরকে লিপ্ত। আর এরাই খ্রিস্টানদের মধ্যে সংখ্যাগুরু।

ত্রিত্ববাদীদের সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

অবশ্যই তারা কুফরি করেছেন যারা বলেছে 'আল্লাহই তো মরিয়াম পুত্র মসীহ।' (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৭২)

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন।' (সূরা মায়েদাহ ৫ ঃ ৭৩)

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ এক বাদশাহের দরবারে এক যাদুকর ছিল। যাদুকর এক যহীন বালককে যাদুবিদ্যা শিখাত। কিন্তু বালকটি এক তাওহীদপন্থী সাধকের ওয়ায নসীহত শুনে এক আল্লাহতে ঈমান আনে। বালকটির কাজের মাধ্যমে ঐ এলাকার অসংখ্য নারী পুরুষ ও তাওহীদে বিশ্বাসী হয়। তখন বাদশাহই বালকটিকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে। তাওহীদপন্থী জনগনকে শায়েস্তা করার জন্য বাদশাহ একটি আগুনের খন্দক তৈয়ার করে। মুসলিমরা আল্লাহর নাম নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। একজন নারীর কোলে ছিল দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু। শিশুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের মন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আল্লাহ শিশুটির মুখে জবান

দেন। সে বলে, 'মা, আপনি সত্যের উপর রয়েছেন। নিশ্চিন্তে আগুনে ঝাঁপ দিন।' তখন তিনি শিশুটিকে নিয়ে আগুন বরণ করলেন। (মুসলিম)

নবীগণের পুজা: বিভিন্ন সময় মানুষ নবীগণের পুজায় লিপ্ত হয়েছে। ইহুদীদের একাংশ উযায়র ﷺ কে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করেছে। ত্রিত্ববাদী মসীহীরা ঈসা মসীহ ﷺ কে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করেছে। আর মুসলিম ও সুফী নামধারী একদল লোক মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং বিপদে -আপদে মুহাম্মাদ ﷺ এ কাছেই ইয়ানত চায়।

শরফুদ্দীন বুছিরী (মৃত ৬৯৫ হি.) বলেছে

فإن من جودك الدنيا وضرتها # ومن علومك علم اللوح والقلم

অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাত আপনার দান

ওহে মাহফুয ও কলমের এলেম আপনার অংশ মাত্র।

বুরী আরো বলেছে:

ما سامني الدهر ضيما واستجرت به # إلا ونلت جوارا منه لم يضم

যখনই আমি রোগাক্রান্ত বা চিন্তাগ্রস্থ হয়েছি এবং রাসূলের নিকট আরোগ্য ও চিন্তামুক্তির আবেদন করেছি তখনই তিনি আরোগ্য ও মুক্তি দান করেছেন।

বলা হয়ে থাকে বুছিরী তার এসব কবিতা রচনার পুরস্কার হিছাবে নবী ﷺ এর কাছ থেকে স্বপ্নে একটি বুরদাহ (চাদর) লাভ করে। তার কাসীদা সংকলনকে কাসীদায়ে বুরদাহ বলা হয়। সত্যিই যদি সে কোন চাদর পেয়ে থাকে তবে তা ছিল শয়তানের চাদর। শিরকী কাসীদা শুনে নবী ﷺ রাযী হবেন এটা মুমকিন নয়।

সত্যিকারের কাসীদায়ে বুরদাহ হচ্ছে সাহাবী কা'ব বিন যুহায়ের رضي الله عنه কর্তৃক রচিত ' বানাত সু'আদ' কাব্য যা শুনে নবী ﷺ তার জীবদ্দশায় তাকে তার বুরদাহ (চাদর) হাদিয়া দিয়েছিলেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, 'বুছিরী' নামে একজন মুহাদ্দিছ আছেন; তিনি আহমদ বিন আবী বাকর বুছিরী (মৃত; ৮৪০ হি.)

নবীগণ বা ফেরেশতাগণ বা ওলীগণের কোন ক্ষমতা নেই মানুষের চাহিদা পূরণ করার। তাদের কাছে দোয়া করা যাবে না। এমনকি তাদেরকে এমন সম্মান দেখানো যাবে না যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।

নবী ﷺ-এর কাছে একদা মযলুম মুসলিমগণ সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, "আমার কাছে গাওছ চাইতে হয় না। আল্লাহর কাছেই গাওছ চাইতে হয়।" (তাবারানী)

রুবাই বিনতে মাওয়ায়িয (রহ) বলেন, "আমার উরছ (নিকাহ উৎসব) -এর সকালে রসূল ﷺ এলেন এবং আমার কাছে দু'জন বালিকা গান গাইছিল। তারা দু'জন যা বলছিল তার মধ্যে ছিল, "আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি এলেম রাখেন আগামীকাল কী হবে।" নবী ﷺ বললেন, "একথা বলো না। কেউ এলেম রাখে না আগামীকাল কি হবে আল্লাহ ব্যতীত।" (বুখারী)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"তুমি বল, যারা আসমানসমূহ ও ধরণীতে আছে তারা গায়েব জানে না, ব্যতিক্রম আল্লাহ।" (সূরা আন-নামল ২৭ ঃ ৬৫)

নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমরা আমার কাছে তোমাদের বিবাদ আরয করে থাক। অবশ্যই আমি একজন মানুষ। সম্ভবতঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশী পটু। এ কারণে যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের হক দেই তবে সে যেন এটা না নেয়। কারণ আমি (হয়ত) তাকে জাহান্নামের একটা টুকরা তুলে দিয়েছি। (আবু দাউদ, নাছায়ী)

নবী ﷺ যদি গায়েব জানতেন তবে বিচারে ভুল ফয়সালা দেবার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

সাহাবাদের একদল নবী ﷺ বলেছিলেন, "মানুষের জন্য শোভা পায় না যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদাহ করবে।" (আহমদ)

একদা এক ব্যক্তি জাফর সাদিক (রহঃ)-এর লাঠি চুমু দেয়, কারণ লাঠিটি ছিল রসূল ﷺ-এর। এতে জাফর সাদিক (রহঃ) বললেন "যা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না তাকে কেন চুমু দিচ্ছ? ফেরেশতাগণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

"তারা শাফাআত করে না যাদের উপর তিনি (আল্লাহ) রাযী তাদের জন্য ছাড়া।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১ ঃ ২৮)

মক্কা শরীফে ইবরাহীম ও ইসমাঈল ﷺ কা'বা ঘর পূনর্নির্মাণ করেছিলেন। সময়ের সাথে আরবরা তাওহীদের শিক্ষা ভুলে যায়। তাদের মধ্যে শিরক ঢুকে পড়ে। তারা মৃত মানুষের পূজা, ফেরেশতাদের পূজা এবং গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের পূজায় লিপ্ত হয়। লাত নামে এক ব্যক্তি হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করত ও সাহায্য করত। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে এক সময় তার পূজা শুরু হয়ে যায়। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামে খেজুর বাগানের একটি গাছের নাম ছিল আল-উয্যা। এই গাছটিকেও আরব মুশরিকরা পূজা করত। মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এক জায়গায় একটি বড় পাথরকে পূজা করা হত। পাথরটিকে আরবরা বলত মানাত। তারা ঐ পাথরের কাছে পশু যবাহ করে রক্ত প্রবাহিত করে মনবাসনা পূরণের আশা করত। গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা আরব, মিশর, গ্রীক, রোমান ও হিন্দুদের মধ্যে চালু ছিল, এখনও আছে।

সূর্য পূজা ঃ আরবদের মধ্যে কিছু মুশরিক সূর্যের পূজা করত। তারা সূর্যকে বলত ইলাহাহ অথবা শামছ। আরব মুশরিকরা "আব্দুশ শামছ' বা 'সূর্যদেবীর বান্দা' এমন নামও রাখত।

গ্রীক ও রোমান মুশরিকদের কাছে সূর্য হেলিয়স বা এপোলো বা সল ইনভিক্টাস নামে পরিচিত ছিল যাকে তারা চিকিৎসার দেবতা মনে করত।

মিশরীয়রা সূর্যকে বলত রা (Ra) দেবতা। রা-এর পিতা থথ্ (Thoth) কে তারা বিশ্বের পয়দাকারী ও জ্ঞানের দেবতা বলে মনে করত।

হিন্দুমতে কাশ্যপ ও অদিতির পুত্র সূর্যদেব বা বিবস্বান। হিন্দুরা সূর্যের এক পুত্র সত্যব্রত মনুকে মানুষ জাতির আদি পিতা মনে করে। মহাভারতের বর্ণনা মতে পান্ডু-র পত্নী কুন্তী। কিন্তু কুন্তীর বিবাহের আগেই তার সাথে সূর্যদেবের মিলনে কর্ণ-এর জন্ম হয়। তবে কর্ণকেও পান্ডব (অর্থাৎ পান্ডুর পুত্র) বলে বিবেচনা করা হয়।

লুব্ধক নক্ষত্র পূজা : আরব মুশরিকরা লুব্ধক নক্ষত্র (যাতে আরবীতে শি'রা এবং ইংরেজিতে Sirius অথবা Dog-star বলা হয়)-এর পূজা করত। সূরা নাজমে এর উল্লেখ আছে।

চাঁদ পূজা : আরব মুশরিকরা চাঁদকে শক্তির দেবী বলে মনে করত যাকে তারা বলত হুবাল। উহুদের যুদ্ধে অনেক মুসলিম নিহত হলে আবু সুফিয়ান বলেছিল, "আজকের বিজয় বদরের বদলা। হে হুবাল! দেখিয়ে দাও যে তুমি ওদের চেয়ে বড়।" মুসলিম তরফ থেকে জওয়াব দেয়া হলঃ "আল্লাহই সবচেয়ে বড়। আমরা সকলে সমান নই। আমাদের মৃতরা যাবে জান্নাতে আর তোমাদের মৃতরা জাহান্নামে।" (সীরাতু রসূলুল্লাহ, ইবনু ইসহাক)

মিশরীয়রা চাঁদকে দেবতা মনে করত যার নাম খনসু। গ্রীক ও রোমানরা চাঁদকে সতীত্বের দেবী বরে মনে করত যারা নাম ডায়ানা। হিন্দুরা চাঁদকে গাছ-পালার দেবতা মনে করে যার নাম চন্দ্র বা ইন্দু।

গ্রীক ও রোমান মতে এপ্যোলো (সূর্য), মার্কারি (বুধ), ভেনাস (শুক্র) ও ডায়ানা বা আর্টেমিস (চাঁদ)-এদের সকলের পিতা জিউস বা জুপিটার (বৃহস্পতি)। আর বৃহস্পতির পিতা স্যাটার্ন। গ্রীক ও রোমান মতে সূর্যের পিতামহ শনি অথবা হিন্দু মতে সূর্যের পুত্র শনি। গ্রীক ও রোমান মতে বুধের বোন চাঁদ অথবা হিন্দুমতে বুধের পিতা চাঁদ। এভাবে তারা খেয়ালী কথা বলত।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও নয়। সিজদা কর আল্লাহকে যিনি এগুলিকে পয়দা করেছেন। (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১ : ৩৭)

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾

সূর্য ও চাঁদ হিছাব করা পথে নিয়োজিত। তারকারাজি ও গাছ-পালা [আল্লাহর উদ্দেশ্যে] সিজদারত। (সূরা আর রহমান ৫৫ ঃ ৫-৬)

গরু পূজা : উত্তর মিশরের মেম্ফিতে এক সময় ষাঁড় আকৃতির এক দেবতার পূজা করা হত যার নাম হাপি। হিন্দুমতে মহাদেব শিবের বাহন ষাঁড়। বনী ইসরাঈলের একদল এক সময় বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইঁদুর পূজা ঃ হিন্দু মতে ইঁদুর গনেশের বাহন। ইন্ডিয়ার রাজস্থান প্রদেশে দেশনোক শহরের নিকটে করনি মাতা মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে ইঁদুর পূজা করা হয়।

শেয়াল পূজা ঃ মিশরীয় মুশরিকরা শেয়াল আকৃতির এক দেবতাকে বিশ্বাস করত যার নাম আনুবিস।

তা'বীজের উপর ভরসা

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

নবী ﷺ বলেন, যে তামীমাহ (তা'বীজ) ঝুলালো সে অবশ্যই শিরক করলো। (আহমাদ)

সহীহ হাদীস সমূহ থেকে কুরআনের আয়াত ও সুন্নাতী দু'আ পড়ে শরীরে ফুঁ দেয়ার দলীল পাওয়া যায়; কিন্তু এসব দু'আ তা'বীজ করে ঝুলিয়ে রাখার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে এমন তা'বীজও ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাতে কুরআনের আয়াত বা সুন্নতী দু'আ থাকে না বরং শিরকী ও কুফরী কালাম থাকে। অনেক তা'বীজ ব্যবহারকারী মোটেও জানে না যে, তিনি তার গলায় কী ঝুলিয়ে রেখেছেন।

একটি তা'বীজের নকশা উল্লেখ করছি।

ابليس	هامان	شيطان	فرعون
شيطان	فرعون	ابليس	هامان
فرعون	شيطان	هامان	ابليس
هامان	ابليس	فرعون	شيطان

[তাবীজের কিতাব, মুহাম্মাদ ইছহাক/ চরমোনাইয়ের পীর] আল-ইছহাক প্রকাশনী, ১৩৯৭ বাংলা। পৃষ্ঠা ৩৮]

তা'বীজ হিছাবে এস্তেমাল করা হয় শরফুদ্দীন বুছিরীর লেখা কাসীদায়ে বুরদাহ এবং জাযুলী রচিত দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের অংশবিশেষ। উভয় লেখকই শিরক করত এবং তাদের কাসীদাগুলিতে শিরকী ও কুফরী কালাম পাওয়া যায়।

শিরক্ করে কি লাভ?

যারা শিরক করে তারা মনে করে যে, পাপী মানুষের জন্য সরাসরি পরমেশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া শোভনীয় নয়। পরমেশ্বর তার দয়া ও দান বন্টন বা বিতরণের জন্য দেবদেবী, ফেরেশতা বা নক্ষত্রসমূহের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই তাদের কাছ থেকেই দয়া ও দান চেয়ে নিতে হবে। সত্য কথা হল তাদের এই ধারণা ভুল।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾

তার চেয়ে বেশি পথভোলা কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে দোয়া করে তার কাছে যে তার জওয়াব দেবে না কিয়ামত দিবস পর্যন্ত?

(সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬ ঃ ৫)

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

সাহায্য কখনই আসতে পারে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থেকে।

(সূরা আনফাল ৮ ঃ ১০)

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য কাফী নন? (সূরা সোয়াদ ৩৯ ঃ ৩৬)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

আল্লাহর সাথে অন্য কারো কাছে দোয়া করো না। (সূরা আল-জ্বীন ৭২ ঃ ১৮)

﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ মাফ করবে? (সূরা আলি-ইমরান ৩ ঃ ১৩৫)

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন, তোমরা আমার কাছে দোয়া কর; আমি তোমাদেরকে জওয়াব দেব। (সূরা আল-মুমিন ৪০ ঃ ৬০)

শিরক করলে কী ক্ষতি

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং আগুন হবে তা নিবাস। (সূরা মায়িদাহ ৫ ঃ ৭২)

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যদি তারা শিরক করে তবে নষ্ট হয়ে যাবে যা তারা আমল করে।

(সূরা আনআম ৬ ঃ ৮৮)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং তার সাথে শিরককে জড়িত করেনি তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই ঠিক পথে চালিত। (সূরা আনআম ৬ ঃ ৮২)

নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না যদিও তোমাকে কতল করা হয় এবং পুড়িয়ে দেয়া হয়।" (মিশকাত)

একজন মুসলিম শিরক জড়িত মাহফিল বা ঈদে হাজির থেকে খুশী হতে পারে না। বরং শিরকী আমল দেখলে একজন তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অন্তর নেহায়েত বেদনায় ভরে যাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের সাথে আমরা

দেখছি অনেক মুসলিম নামধারী দুর্গাপুজা, মীলাদে মসীহ (বড়দিন) ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হাজির হন, তাদের সাথে আনন্দ করেন। অনেকে বলেন 'দুর্গা পুজা মঙ্গল বয়ে আনুক', 'দুর্গাপুজা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উৎসব', ' দুর্গা পুজার শুভেচ্ছা জানাই' ইত্যাদি। একজন মুসলিম কখনই এটা ভাবতে পারেন না যে, শিরকের মাধ্যমে কোন মঙ্গল হতে পারে। অতএব এসব কথা যারা বলেন এবং যারা এসব মাহফিলে শরীক হন তারা ক্ববরে 'আমার দীন ইসলাম' একথা বলতে পারবেন কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

একত্ববাদ বা তাওহীদের পথই সত্য পথ আর এই তাওহীদ ভিত্তিক বিশ্বাসে কোন জটিলতা, অস্পষ্টতা নেই। তা সত্ত্বেও মানুষজাতির বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাওহীদের সঠিক ও সোজা পথ ছেড়ে বহু ঈশ্বরবাদ বা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কারণ শয়তান তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মানুষকে একত্ববাদের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য হামেশা মেহনত করে চলেছে। অতএব একত্ববাদের পথে থাকতে হলে হামেশা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

[মুসলিম ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-২০০৯]

তাহলীলের কদর

তাহলীল (تحليل) বা হাইয়ালাল্লাহ (هيللة) মানে জয়গান গাওয়া, শ্লোগান দেয়া, তারীফ করা। ইসলামী পরিভাষায় তাহলীল বলতে বুঝানো হয় *'লা-ইল্লাল্লাহ'* বলা তাহলীলের ফযীলত ও কদর অন্য যে কোন বাক্যের চেয়ে বেশি। কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

অতএব তুমি জেনে রাখ যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্ল-হ ছাড়া উপাস্য নেই) আর তুমি তোমার ভুলের জন্য এস্তেগফার কর এবং ঈমানদান পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের জন্যও (এস্তেগফার কর)। আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে এলেম রাখেন। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ১৯)

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾

যখন অপরাধীদেরকে বলা হত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখন তারা তাকাব্বুর করত। (সূরা সাফফাত ৩৭ঃ ৩৫)

তাহলীলের ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস ঃ

হাদীস নং ১ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত ঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, ইসলামের খুঁটি পাঁচটি– এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল, সালাত কায়েম রাখা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা এবং রমযানের সওম পালন করা। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীস নং ২ ঃ আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত ঃ নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মওত বরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে জানে (অর্থাৎ পুরোপুরি বিশ্বাস করে) যে 'লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে দাখিল হবে। (মুসনাদে শাফিয়ী।)

হাদীস নং ৩ ঃ মুআয বিন জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন ঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। (মুসনাদে আহমদ)

হাদীস নং ৪ ঃ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলল সে ঐ দিনের এ মুহূর্ত থেকে এ কালিমার দ্বারা উপকার পেতে থাকবে যদিও এর আগে সে বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়েছিল।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব)

হাদীস নং ৫ ঃ নবী ﷺ বলেন ঃ একদা মূসা ﷺ বললেন, "হে আমার রব! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন যা দিয়ে আমি আপনার জিকির করব এবং আপনার কাছে দোআ করব।" আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি বল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। মূসা ﷺ বললেন, এ ত আপনার সকল বান্দাই বলে। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! সাত আসমান এবং আমি ব্যতীত যা এর পিছনে কাজ করে এবং সাত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্য এক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমাহযুক্ত পাল্লা ভারী হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

হাদীস নং ৬ ঃ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন ঃ জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিকে বের করা হবে যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান। (সহীহ বুখারী)

হাদীস নং ৭ ঃ আবু হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর। বলা হল, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়ন করব? তিনি বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কওলটিকে বেশি বেশি পড়। (মুসনাদে আহমদ)

হাদীস নং ৮ ঃ জাবির বিন আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ জিকির হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ দোআ হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ।' (তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান)

হাদীস নং ৯ ঃ আবু হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন ঃ আমার শাফাআত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে ঐ ভাগ্যবান মানুষ যে তার অন্তর থেকে খালেসভাবে বলেছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

(মুসনাদে আহমদ)

বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায় যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা বিশ্বাস করার কারণে কালেমা কবুলকারীকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, জাহান্নামে চিরকাল রাখা হবে না।

ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, "মুরজিয়া ফেরকার লোকেরা বলে যে, কেউ কালেমাহ শাহাদাত পড়লে সে যতই গুনাহ করুক জাহান্নামে যাবে না। এভাবে তারা গুনাহগার তাওহীদপন্থীকে জাহান্নাম থেকে (আযাব দেয়ার পরে) বের করার সহীহ হাদীস অস্বীকার করেছে।"

(তালবীছু ইবলীস, ইবনে জাওযী, কায়রো ছাপা, পৃ. ৮৮)

ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) লিখেছেন, "আবু হাশিম মুতাযিলী বলেছে যে, যে ব্যক্তি সব গুনাহ থেকে তওবা করেছে কিন্তু এক ঢোক মদ পান করেছে সে চিরকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে পারবে।"

(তালবীছু ইবলীস, পৃ. ৮৭)

মুরজিয়া ও মুতাযিলাদের এসব ধারণা ভুল। সম্প্রতি বাংলাদেশের একজন ডাক্তার "কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?" শিরোনামে একটি কিতাব লিখেছেন যাতে তিনি মুতাযিলীদের মতকেই সমর্থন করেছেন। একদা এক ব্যক্তি সাহাবী জাবির ইবন আব্দিল্লাহ ﷺ-এর সামনে অন্তকাল জাহান্নামে অবস্থানের সকল আয়াত পড়ে শুনালো। জাবির ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি কুরআন-হাদীসে আমার চেয়ে নিজেকে বেশি এলেমদার মনে করেছ। সে বলল, "আস্তাগফিরুল্লাহ! এমনটি আমি কল্পনাও করতে পারি না।" জাবির ﷺ বললেন, শোন! এইসব আয়াত মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে। এইসব আয়াতে তাদের উল্লেখ নেই যাদেরকে আযাব দেয়ার পর জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়া হবে। তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের কথা হাদীসে উল্লেখ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ)

হাদীস নং ১০ ঃ আবু হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন ঃ কোন বান্দা এমন নেই যে সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আর তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় না। এমনকি এই কালেমাহ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, এর পাঠকারী কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। (নাছায়ী)

হাদীস নং ১১ ঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে দাখিল হবে। (আবু দাউদ)

সাহাবীর বাণী ঃ আবু বকর ﵁ বলেন, কবর হচ্ছে অন্ধকার, আর তার আলো হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ।'

(আল মুনাব্বিহাত লি আসকালানী)

মহান আল্লাহর কাছে একান্ত আরয – আমাদের তাসবীহ, তাহলীল ও সকল ইবাদত যেন খালেস হয়, যেন সের্ফ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে হয়।

[মুসলিম ডাইজেষ্ট জুলাই ২০১১]

তালীক (দ্রষ্টব্য) : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কালিমা একবার পড়লে যে ছওয়াব্ পাওয়া যায়, দশবার পড়লে, একশত বার, হাজার বার, সত্তর হাজার বার পড়লে বেশী বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু সত্তর হাজার বার পড়লে মুর্দা জাহান্নাম থেকে জান্নাতে দেয়া হবে বলে যে কেচ্ছা চালু আছে তা মিথ্যা। কিচ্ছাটি হল।

শাইখ আবু ইয়াযিদ কুরতবী বলেন, আমি শুনিয়াছি যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার কালিমাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে, সে দোযখ থেকে নাজাত পাইবে। ইহা শুনিয়া আমি নিজের জন্য সত্তর হাজার বার ও আমার স্ত্রীর জন্য সত্তর হাজার বার এবং এরূপে এই কালিমার কয়েক নেছাব আদায় করিয়া পরকালে ধন সংগ্রহ করি। আমাদের নিকটে একজন যুবক কাশফওয়ালা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সে নাকি বেহেশত ও দোযখ দেখিতে পাইত। আমি উহাতে সন্দেহ করিতাম। এক সময় ঐ যুবক আমার সহিত আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল ও বলিল, আমার মা দোযখে জ্বলিতেছেন। তাহার অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি। যুবকের অস্থিরতা দেখিয়া আবু ইয়াযিদ কুরতবী বলেন, আমি মনে মনে সত্তর হাজার কালিমা পড়ার একটা নেছাব ঐ যুবকের মায়ের জন্য বখশীশ করিয়া দিলাম। কিন্তু এক আল্লাহ ব্যতীত আমার এই আমলের কথা কারও জানা ছিল না। হঠাৎ যুবক বলিয়া উঠিল, চাচা, আমার মা দোযখ হইতে নাজাত পাইয়া গেলেন।

আবু কুরতুবী বলেন, কেচ্ছা দ্বারা আমার দু'টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইল। প্রথমতঃ সত্তর হাজার বার কালেমা পড়ার বরকত, দ্বিতীয়তঃ ঐ যুবকের কাশফের সত্যতাও প্রমাণিত হল। (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির, যাকারীয়া কান্ধালভী, বাংলা তরজমা, তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা। পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২, দারুল কিতাব, ঢাকা পৃষ্ঠা ১৩৫)

আসলে কেচ্ছাটির দ্বারা দু'টি বিষয়ের কোনটিই প্রমাণিত হয় না। কারণ সত্তর হাজার বার কালিমাহ পড়ার উক্ত ফযীলত ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অন্যদিকে কাশফ দ্বারাও কোন বিষয় প্রমাণ করা যায় না। নবী ﷺ ব্যতীত দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম মওতের আগে দেখা সম্ভব হয়েছে এমন আক্বীদাহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে স্বীকৃত নয়।

ওয়াহদাতুল উজুদ, হুলুল ও ফানাতত্ত্ব

মুসলিম নামধারী কয়েকটি সুফী ফেরকার মধ্যে এসব কুরআনবিরোধী তত্ত্ব প্রচলিত। ওয়াহদাতুল উজুদ (অস্তিত্বের একত্ব) এমন একটি মতবাদ যাতে বিশ্বাস করা হয় যে খালেক ও মখলুকের মধ্যে কোন তফাত নেই বরং সকল অস্তিত্ব মিলে একটিই সত্তা। হুলুল এমন একটি ধারণা যাতে মনে করা হয় স্রষ্টা কোন কোন সৃষ্টির ভেতরে ঢুকে পড়েন। ফানা শব্দের অর্থ ধ্বংস হওয়া। কিছু সুফী গোষ্ঠি ফানা ফীল্লাহ বলতে ব্যক্তির সত্তা স্রষ্টার সাথে মিশে যাওয়া বুঝিয়ে থাকে। ইসলামী ঈমানের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে আল্লাহ তার সৃষ্টি থেকে আলাদা। তিনি আসমানের উপরে অবস্থান করেন যেমনটা সূরাহ মুলকে বারবার বলা হয়েছে। তিনি কিছু পয়দা করতে চাইলে কেবল বলেন হও তার তা হয়ে যায়। তিনি তার সৃষ্টিজগতকে ঘিরে রেখেছেন। তিনি সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তার ক্ষমতা ও ইলম সর্বত্র বিরাজমান।

যারা ভুল মতবাদে বিশ্বাসী তারা বলে থাকে আল্লাহর নূর দ্বারা আসমানসমূহ ও যমীন পয়দা হয়েছে, আল্লাহর নূর থেকে মুহম্মদ ﷺ এর নূর তৈয়ার করা হয়েছে ইত্যাদি। বস্তুত কুরআনের আয়াত

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর (২৪:৩৫) দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি আসমানসমূহ ও যমীনের উপকরণ আল্লাহর নূর। সাহাবী আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, আল্লাহর নূর হচ্ছে হেদায়াত। অন্য সাহাবী ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহ আসমানবাসী ও যমীনবাসীদের পথ দেখানেওয়ালা। (তাফসীর ইবনে কাসীর) আল্লাহর নূর দ্বারা মুহম্মদ ﷺকে তৈয়ার করা হয়েছে বলে যে দাবি করা হয় তা ঠিক নয়। এই মতের সমর্থনে যেসব হাদীস বয়ান করা হয় তার সবই মওযু অর্থাৎ বানোয়াট।

আলী ইবনে হাসান ইবনে সাদিক একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ:) কে বললেন, "আমরা আমাদের রব্ব সম্পর্কে কেমন জানি? তিনি

বলরেন, তিনি সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশে। আমরা জাহমিয়াদের মত বলি না, তিনি এখানে দুনিয়ায়।"

(আস-সুন্নাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, পৃ. ৭)

কুরআন ও হাদীসে হুলুল ও ওয়াহদাতের কোনই সমর্থন না পেলেও কিছু সুফী তাদের পূর্ববর্তী সূফীদের স্বপ্ন ও মানসিক বিকারজনিত উপলব্ধিকে এর বড় দলীল বলে মনে করে। তারা মনে করে ইবনে আরাবী, হুসাইন বিন মনসুর হাল্লাজ, জাযুলী, বায়েজিদ, এমদাদুল্লাহ এরা বড় বুযুর্গ ছিলেন; তারা যা উপলব্ধি করেছেন তা সত্য হতে বাধ্য। এইসব স্বপ্ন ও মানসিক বিকারজনিত উপলব্ধির কোনই মূল্য ইসলামে নেই।

ইবনে আরাবীই (মে. ১২৪০ ঈসারী) পহেলা ওয়াহদাতুল উজুদ মতবাদ মুসলিমদের মধ্যে আমদানি করে। সে বলেছে, "আল্লাহ আমার ইবাদত করেন এবং আমি তার ইবাদত করি।" (নাউযুবিল্লাহ)

আবু নাসর ছিরাজ বলেন, হুলুলিয়া সুফীদের জামাআত বিশ্বাস করে যে মহান হক (অর্থাৎ আল্লাহ) কতক দেহকে বেছে নেন এবং তার মধ্যে রবুবিয়াত (ঈশ্বরত্ব) ঢুকিয়ে দেন।

(তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনুল জাওযী, পৃ. ১৭৬)

ইবনে মনসুর হাল্লাজ (মে. ৩০৯ হিঃ) বলেছিল, "আমিই হক (অর্থাৎ আল্লাহ)। হাল্লাজ আরো বলেছিল,

بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب -

তিনি তার সৃষ্টিজগতে যাহির হয়েছেন আহারকারী ও পানকারীর সূরতে।

হাল্লাজ তার পুত্রবধুর সাথে জেনা করার চেষ্টা করেছিল এবং ঐ পুত্রবধুকে হুকুম করেছিল তাকে ছিজদাহ করতে। (তালবীছু ইবলীস পৃ. ১৭৮)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) (ম. ৫৯৭ হিঃ) বলেন, সূফীদের একটি জামাআত হাল্লাজের পক্ষসমর্থন করেছে তাদের জাহেরিয়াতের কারণে। এখন ঐসব লোকদেরকে চেনা জরুরী যারা হাল্লাজের মতবাদে বিশ্বাসী।

বায়েযিদ বুস্তামী সুবহানাল্লাহ (সকল পবিত্রতা আল্লাহর) না বলে বলত সুবহানী সুবহানী (সকল পবিত্রতা আমার, আমার)।

(শামায়েম এমদাদিয়াহ, পৃ. ৩৬)

মুহম্মদ বিন সুলায়মান জাযুলী (ম. ১৪৬৪ ঈসায়ী) তার দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে লিখেছে,

اغرقني في عين بحر الوحدة

আমাকে ওয়াহদাতের সাগরে ডুবাও।

এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (ম. ১৩১৭ হি:) বলতেন, "মানুষ জাহেরভাবে দাস এবং বাতেনভাবে হক্ব (অর্থাৎ আল্লাহ)।"

এমদাদুল মুশতাক (উর্দু), আশরাফ আলী থানভী, পৃ. ৬২।

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (মৃৎ১৩৬২ হি:) তার পীর এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে লেখা চিঠিতে পীরকে এভাবে সম্বোধন করেন, "হে আমার দুই জাহানের আশ্রয়স্থল!" (ফাজায়েলে সাদাকাত, জাকারিয়া কান্ধালূভী তাবলীগী কুতুব খানা ঢাকা। ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭০)

আল্লাহ ছাড়া কেউ আশ্রয়স্থল হতে পারেন না।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾

তিনি সকলকে আশ্রয় দেন, তার উপর কেউ আশ্রয় দাতা নেই।

(সূরা আল-মুমিনুন ২৩ঃ ৮৮)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾

আমারই অধিকারে আখিরাত ও ইহজগত। (সূরা লাইল ৯২ঃ ১৩)

রশীদ গাঙ্গুহীর মুরীদ খলীল আহমদ এবং খলীল আহমদের মুরদীদ আক্তার ইলিয়াছ (ম. ১৯৪৪ ঈসায়ী) যিনি তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা। আক্তার ইলিয়াছের ভাতিজা জাকারিয়া কান্ধালভী চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া এই চারটি সুফী তরীকার পীরগণের কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। তার ফাজায়েলে আমল, ফাজায়েলে সাদাকাত ইত্যাদি কেতাবে চার তরীকার সুফী বুযুর্গ ও পাগলদের বিভিন্ন উদ্ভট ও আজগুবী কেসসা বর্ণিত হয়েছে।

ফাজায়েলে আমলের ফাজায়েলে জিকিরে এক পাগলের বর্ণনা আছে যে বলত আমি আল্লাহকে দেখি। (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির, যাকারীয়া কান্ধালভী, বাংলা তরজমা, তাবলীগী কুতুবখানা, .ঢাকা। পৃষ্ঠা ৩৬৭, দারুল কিতাব, ঢাকা পৃষ্ঠা ২৬৪)

এই বর্ণনার পরের ঘটনাটিতে বলা হয়েছে রাদীম নামক সুফীকে তার মওতকালে কালেমা তালকীন করতে থাকলে তিনি বলেন, তিনি ছাড়া অন্য কাউকেই চিনি নাই। (ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে জিকির, যাকারীয়া কান্ধালভী, বাংলা তরজমা, তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৩৬৮, দারুল কিতাব, ঢাকা পৃষ্ঠা ২৬৫)

এই বক্তব্যের দ্বারা ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

অনেক সময় জামাতের যরুরত ও আমীরের এত্তেবা করার তাকীদ দিয়ে বিদআতী ফিরকায় শামিল হতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু জানতে হবে যে, যে জামাআত হকের উপর ছাবেত নয় সে জামাআতে থাকা লোকসানের কারণ হবে। ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জামাআত তা যাহ হক্ব মাফিক হয়, যদিও তুমি একাকী হও। (ইবনে আসাকীর)

হে সচেতন পাঠকমণ্ডলী। আসুন এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং এমনভাবে বিশ্বাস করি যেভাবে কুরআনও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূর্তিভক্তি মানুষকে শিরকের পথে নিয়ে যায়

উম্মে সালামা ﷺ একদা নবী করীম ﷺ-কে জানালেন যে, তিনি আবিসিনায়ায় এমন গীর্জা দেখেছেন যার মধ্যে মূর্তি ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, "ঐ লোকেরা তাদের মধ্যকার কোন সৎকর্মশীল লোক বা সৎকর্মশীল বান্দা মারা গেলে তার কবরের উপরে মসজিদ বানায় এবং সেখানে তাদের মূর্তি তৈরী করে রেখে দেয়। ওরা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে জঘন্য হিছাবে বিবেচিত।" (বুখারী, মুসলিম)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"আর তারা বলেছিল, তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করবে না এবং ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে পরিত্যাগ করবে না।" (সূরা নূহ ৭১ ঃ ২৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, "এই নামগুলি (ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর) হযরত নূহ ﷺ-এর কওমের সৎকর্মশীল লোকদের নাম। যখন তারা মারা গেলেন, তখন শয়তান তার কওমের লোকদেরকে ওহী করল, তারা যেন তাদের বসার জায়গাগুলোতে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নাম লিখে সাজিয়ে রাখে। লোকেরা তা করল। তবে তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত কওমের লোকেরা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়নি। কিন্তু তারা মারা যাওয়ার পর এলেম ভুলে যাওয়ার ফলে লোকেরা মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিল। (বুখারী)

ভাস্কররা দাবি করেন যে, তারা মূর্তি পূজার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেন না। তারা কেবল বিশিষ্ট লোকদেরকে সম্মান জানানোর জন্য বা ঐতিহ্য চর্চার জন্য এগুলো নির্মাণ করেন। কিন্তু মানুষ মূর্তিকে সম্মান করতে করতে কালক্রমে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়, যা উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে বোঝা যায়।

একইভাবে আমরা দেখি যে, আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিংকনের মূর্তি, রাশিয়ায় লেনিন ও ষ্টালিনের মূর্তি এবং ফ্রান্সে নেপোলিয়নের মূর্তি বড় বড় রাস্তায় স্থাপন করা হয়েছে তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় পথচারীরা মাথা থেকে টুপি বা হ্যাট খুলে বা মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানায়। মানুষ হয়ে মানুষের বা মানুষের মূর্তির পূজা করা মানুষের জন্যই অপমান।

আমাদের যমানার লোকদের অবস্থা নূহ ﷺ-এর কওমের চেয়েও খারাপ। নূহের ﷺ কওমের লোকেরা সৎকর্মশীল লোকদের মূর্তি বানাত। আর আমাদের যমানায় আল্লাহর সাথে বিদ্রোহী লোকদেরও মূর্তি বানানো হচ্ছে। মুর্তি বানানোতে বাধা দিলে মূর্তিকে যারা খুবই ভালবাসেন তারা তাদের মূর্তিভক্তি জাহির করার জন্য রাস্তায় নেমে পড়েন। মূর্তির প্রতি তাদের এত মহব্বতের হেতু কি?

একজন মুসলিম মূর্তিকে ভালোবাসবে এমন হওয়া মোটেই শোভনীয় নয়। নবী করীম ﷺ বলেন,

إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير –

"যে ঘরে ছবি আছে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।" (বুখারী, মুসলিম, নাছায়ী)

নবী ﷺ বলেন,

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل –

ফেরেশতাগণ ঐ ঘরের ভিতরে যান না যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে। (নাছায়ী)

অন্য বর্ণনায় আছে, "নবী ﷺ কোন ঘরে ছবি দেখলে তা সরিয়ে না ফেলা পর্যন্ত ঐ ঘরে প্রবেশ করতেন না।" (বুখারী, মুসলিম)

আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, "রাসূল ﷺ বাড়িতে ছবি ঝুলাতে, ছবি আঁকতে এবং ছবি আঁকাতে নিষেধ করেছেন।" (তিরমিযী)

আলী ﷛ থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, 'কোন মূর্তি চূর্ণ না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর জমিনের সমান না করে রাখবে না।" (মুসলিম)

নবী ﷺ কবরে চুন লাগাতে অথবা কবরকে পাকা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ কবরের উপর কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের সবচেয়ে কঠিন আযাব দেয়া হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির নকল করে। (বুখারী, মুসলিম)

যতবড় চিত্রশিল্পী বা ভাস্করই হোক না কেন, আল্লাহ কোন মানুষকে যে চেহারা দিয়েছেন সেই চেহারা সে তৈরী করতে পারবে না। অন্যদিকে কার্টুনিস্টরা ইচ্ছা করেই লম্বা নাক, বড় কান এবং বিরাট বিরাট চোখ বিশিষ্ট মানুষ আঁকে। এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

মোদ্দা কথা, সাধারণ মানুষেরই হোক বা সম্মানিত মানুষেরই হোক অর্থাৎ নবী, রাসূল, ইমাম, দরবেশেরই হোক, কারো ছবি আঁকা ইসলাম অনুমোদন করে না।

মূর্তিভক্তরা প্রশ্ন তুলেছেন আলেম, মোল্লা, হাজী সাহেবরা তো হজ্বে যাওয়া বা বিদেশ সফরের জন্য ফটো তোলেন। পাসপোর্ট বা ভিসার জন্য ফটো নেয়া হয় এই উদ্দেশ্যে যে, কোন ব্যক্তি কোথাও হারিয়ে গেলে বা অপরাধমূলক কাজ করলে যেন তাকে খুঁজে বের করা সহজ হয়। অধিকাংশ আলেম অপরাধমূলক কাজ রোধ করা এবং চিকিৎসা করা বা চিকিৎসা বিদ্যা চর্চার জরুরতের কারণে ফটো তোলাকে নির্দোষ হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি হালাল খাদ্য না পাওয়ার কারণে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় যদি ঘৃণার সাথে হারাম খাদ্য খায়, তবে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'কেউ নিরূপায় হয়ে যদি সে না-ফরমান বা সীমালংঘনকারী হয়, তার কোন পাপ হবে না।" (সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ১৭৩)

মনে রাখতে হবে নিরূপায় অবস্থায় মৃত জানোয়ার বা খিনজির কেউ খেতে পারে, তাই বলে মৃত জানোয়ার বা খিনজিরকে হালাল বলার কোন সুযোগ নেই।

পুতুল, ভাস্কর্য বা মূর্তি যে নামই দেয়া হোক না কেন, সম্মান দেখানোর জন্য, পূজা করার জন্য বা ড্রইংরুম সাজাবার জন্য বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, মূর্তি তৈরি করা বা মূর্তিকে সম্মান করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

যে কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন না, সে কাজ যেন আমাদের কাছে কখনো পছন্দনীয় না হয়, যে কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন সে কাজই যেন আমাদের কাছে পছন্দনীয় হয়, এটাই আমাদের সবসময়ের তামান্না।

[মুসলিম ডাইজেস্ট, ডিসেম্বর, ২০০৮]

কুরআনের আহকাম অস্বীকার আল্লাহকে অস্বীকারের নামান্তর

কুরআন আল্লাহর বাণী, এটি মানুষের রচনা নয়। কুরআনের আদেশ ও নিষেধ মানা মুসলিমদের জন্য ফরয। কোন মুসলিম কুরআনের কোন অংশ বিশেষকে অস্বীকার বা পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে বা অপব্যাখ্যা করতে পারে না।

কুরআন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾

"নিশ্চয়ই এটা ফয়সালাকারী বাণী এবং এটা কোন তামাশার জিনিস নয়। নিশ্চয়ই তারা চক্রান্ত করে। আমিও চক্রান্ত করি অতএব অবাধ্যদেরকে অবকাশ দাও, কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।" (সূরা আত-ত্বরিক্ব ৮৬: ১৩-১৭)

কুরআন অমান্য করার মাধ্যমে উন্নয়নের পরিকল্পনা যারা করছেন তাদের জন্য উন্নয়ন নয়, ধ্বংসই অনিবার্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলিম নাম এবং আলেম পদবীধারী কিছু ব্যক্তি কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করার কোশেশ করছেন।

গত ২২ এপ্রিল ২০০৮ বাংলাদেশ জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সম্মিলিত ইসলামী জোটের' ব্যানারে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সাবেক এমপি রুহুল আমীন মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী আয়শা খানম, রোকেয়া কবীর, ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মইনুদ্দীন খান বাদল, খন্দকার মোজাম্মেল হোসেন, শান্তিপুরের পীর মহিব্বুল্লাহ মোজাদ্দেদী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২৩ এপ্রিল প্রকাশিত খবরের কাগজগুলোতে দেখলাম ঐ বৈঠকে মাওলানা (?) জিয়াউল হাসান বলেছেন, "নারীর উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে

ভাইয়ের অর্ধেকের কথা বলা হলেও এর অধিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের কোন বিধিনিষেধ নেই।" তিনি আরো বলেন, "ভাই বোনকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান সমান সম্পত্তি দিয়ে দিলে ভাইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমে না।"

দেখা যাচ্ছে কথিত আলেমগণ ইসলামী আদর্শবিরোধী সংগঠনের নেতা এবং নারীবাদী বেপর্দা মহিলাদের সাথে বসেছিলেন তাদেরকে নসীহত খয়রাত করার জন্য নয় বরং তাদের কুরআন বিরোধী ধ্যান ধারণার পক্ষে সাফাই গাইবার জন্য।

ভাই বোনকে বা বোন ভাইকে যা ইচ্ছা দিতে পারে, কিন্তু সেটা উত্তরাধিকার বণ্টনকালে নয়। উত্তরাধিকার বন্টনকালে কে কত শেয়ার পাবে তা কুরআনে নির্ধারিত এবং ফরয করে দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

অর্থাৎ "কমই হোক বা বেশিই হোক, এই বন্টনযোগ্য অংশ ফরয করা হয়েছে।" (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৭)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"আল্লাহ তোমাদের আওলাদ সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান; যদি কেবল মেয়ে থাকে তবে দুই বা তার বেশি হলে তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র একটি মেয়ে থাকে তবেজ দুই বা তার বেশি হলে তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র

একটি মেয়ে থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার পিতা ও মাতার প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্টাংশ যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি আর কোনই সন্তান না থাকে তবে পিতা-মাতাই ওয়ারিছ। এক্ষেত্রে তার মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু তার ভাইবোন থাকলে মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। এ সবই সে যা ওসিয়ত করে [ওয়ারিছ ছাড়া অন্য কারো জন্য] তা দেওয়ার এবং দেনা শোধ করার পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের বেশি কাছে। আল্লাহ কর্তৃক এটা ফরয করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এলেমদার, হেকমতদার।"

(সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ১১)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পতির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে এবং এক-চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের সন্তান থাকে; ওসীয়ত পালন এবং দেনা শোধের পর। তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের [তোমাদের স্ত্রীদের] জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে এবং এক-অষ্টমাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের সন্তান থাকে; ওসীয়ত পালন এবং দেনা শোধের পর। যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ বা নারীর ওয়ারিছ থাকে তার একমাত্র ভাই অথবা একমাত্র বোন, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর বেশি হলে সকলে সমঅংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশে; ওসীয়ত পালন ও দেনা শোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয় [ওসীয়ত যেন নিষিদ্ধ ওসীয়ত না হয়]। আল্লাহ কর্তৃক এটা ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ এলেমদার, সহনশীল।" (সূরা আন-নিসা ৪:১২)

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

বল, পিতামাতা ও সন্তানহীন ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ ফতোয়া দিচ্ছেন, "কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ আর সে (বোন) যদি সন্ত ানহীনা হয়ে মারা যায় তবে তার ভাই তার ওয়ারিছ হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আর যদি ভাইবোন উভয়ে থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হতে পার-এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে এলেমদার।"

(সূরা আন-নিসা ৪: ১৭৬)

উল্লেখ্য যে সূরা নিসার উপরোক্ত আয়াতগুলি নাযিলের আগ পর্যন্ত মুমূর্ষ ব্যক্তি ওয়ারিছদের জন্য ওসীয়ত করে যাবে এমন বিধান ছিল।

(দ্রষ্টব্য সূরা বাক্বারাহ ২: ২৪০)।

আয়াতগুলি নাযিলের পর ওয়ারিছ নয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ওসীয়ত করার সুযোগ বহাল থাকে।

রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সকল হকদারদেরকে তার হক দান করেছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিছব্যক্তির জন্য ওসীয়ত নেই।"

(আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারাকুতনী)

এখন কুরআনে নির্দিষ্ট অংশ কেউ যদি কোন ওয়ারিছকে বঞ্চিত করে, যেমন ভাই যদি বোনকে তার প্রাপ্য না দেয় অথবা বোন যদি তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি নেয় তবে তা হালাল হবে না।

আদালত থেকে রায় নিলেই অথবা সরকারের মাধ্যমে আইন পরিবর্তন করলেই যে তা আল্লাহর কাছে বৈধ হবে তা কখনই সম্ভব নয়।

রাসূল ﷺ বলেন, " তোমরা আমার কাছে তোমাদের বিবাদ পেশ করে থাক। অবশ্যই আমি একজন মানুষ। সম্ভবতঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে তর্ক করতে বেশী পটু। এই কারণে যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের হক দেই তবে সে যেন এটা না নেয়। কারণ আমি তাকেই জাহান্নামের একটা টুকরা তুলে দিয়েছি। (আবু দাউদ, নাছায়ী)

২৪ এপ্রিল প্রকাশিত এক পত্রিকায় একজন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন, "যে অনুমিতির উপর নারীর অর্ধেক ভাগ প্রাপ্তিকে যথার্থ মনে করা হয়েছিল, সে অনুমিতি যদি কার্যকর না থাকে, তাহলে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য পরবর্তীকালের আলেম উলামারা দায়িত্ব নেবেন না কেন?" তিনি আরো লিখেছেন, "পুরুষ নারীর ভরণপোষণ করছে, এরকম পরিবারের অনুপাত কমে আসছে। শতকরা ২৫ ভাগ পরিবার নারী প্রধান।" তার মতে নারীকে সমান উত্তরাধিকার দিলে এ পরিবারগুলো ভালো চলবে।

পুরুষরা নারীর ভরণপোষণ করবে এটা কোন অনুমিতি (assumption) নয়; বরং মুসলিম সমাজকাঠামোর এটাই বিধান। পুরুষ নারীর ভরণপোষণ করছে, এমন পরিবারের অনুপাত কমতে থাকা সমাজের জন্য শুভ আলামত নয়। কি কি কারণে পুরুষরা দায়িত্ব পালন করছে না বা করতে পারছে না, কিভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যায় সেদিকে নজর দিলে বুদ্ধিজীবীরা ভালো করতেন। নারীদেরকে অর্থ দিয়ে দিলেই যে তারা ভালো চলবেন বা সমাজ ভালো চলবে এমন নয়।

নারীর অর্ধেক ভাগ প্রপ্তির অর্থ এই নয় যে নারীর মর্যাদা কম। একজন ব্যক্তির কন্যার মর্যাদা তার মায়ের মর্যাদার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি নয়। অথচ ওয়ারিছ হিসাবে কন্যা মায়ের চেয়ে বেশি পায়। যেমন এক ব্যক্তি তার মা এবং দুই কন্যাকে ওয়ারিছ রেখে মারা গেল। মা-কে এক ষষ্ঠাংশ এবং দুই কন্যাকে অর্ধাংশ দেয়ার পর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাকী

থাকে। এই সম্পত্তি থেকে পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ ও অর্ধাংশ হারে তাদের উপরেই রদ্দ করা হয়। বারবার এই প্রক্রিয়া চালানোর বিকল্প হিসাবে প্রথমেই মোট সম্পত্তিকে চারভাগে ভাগ করে একভাগ মা-কে এবং তিনভাগ দুই কন্যাকে দেয়া হয়।

কোন ব্যক্তি মাতা যেমন ঐ ব্যক্তির কন্যার চেয়ে কম অংশ পেতে পারেন, তেমনি কোন ব্যক্তির পিতাও ঐ ব্যক্তির কন্যার চেয়ে কম অংশ পেতে পারেন। বস্তুত: মানুষের মর্যাদা সম্পদ অর্জন বা প্রপ্তির দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না।

নারীকে সমান উত্তরাধিকার এবং সেই সাথে সমান অথনৈতিক দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে নারীকে কার্যত বিপজ্জনক অবস্থানে ঠেলে দেয়া হবে। যারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত পাল্টানোর প্রস্তাব করছেন তারা আল্লাহর গযবের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আল্লাহ নারীদেরকে যে অধিকারগুলি দিয়েছেন, সেগুলি নিশ্চিত করার প্রতিই সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

[মুসলিম ডাইজেস্ট জুন-২০০৮]

শয়তান মানুষের চরম দুশমন

শয়তান আদম সন্তানের চিরকালীন দুশমন, তবে সে কাজ করে বন্ধুবেশে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা শয়তানের পায়ের ছাপ এত্তেবা করো না। অবশ্যই সে তোমাদের সন্দেহাতীত দুশমন। সে তোমাদেরকে মন্দ ও ফাহেশা কাজের আদেশ দেয় আর আদেশ দেয় যে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল যে সম্পর্কে তোমাদের এলেম নাই।"

(সূরা বাক্বারাহ ২ ঃ ১৬৮-১৬৯)

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

"অবশ্যই শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব তাকে দুশমন হিসাবে গণ্য কর।" (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ৬)

শয়তান মানুষের কাছে নিজেকে হিতাকাঙ্খী বন্ধু হিসাবে দাবি করে যেমনটা সে করেছিল হযরত আদম عليه السلام-এর কাছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾

"শয়তান শপথ করে তাদের দু'জনকে বলেছিল, অবশ্যই আমি তোমাদের নসীহতকারী।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ২১)

শয়তানের এ কথা বিশ্বাস করে নিষিদ্ধ গাছ থেকে ফল খাওয়ার অপরাধে আদম عليه السلام ও হাওয়া عليها السلامকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়ে মাটির ধরণীতে এসে বাস করতে হয়।

﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا﴾

কেউ শয়তানকে সাথী বানালে সে হয় অশুভ সাথী। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৩৮)

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾

যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য শয়তানদেরকে আওলিয়া বানিয়েছি। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ২৭)

﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে আওলিয়া গণ্য করে অথচ মনে করে যে তারা ঠিক পথে চালিত। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৩০)

﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾

যে রহমানের যিকির থেকে উদাসীন হয় তার জন্য নিযুক্ত করি এক শয়তানকে, যে হয় তার সাথী। (সূরা আয-যুখরফ ৪৩ ঃ ৩৬)

শয়তানের ইতিহাস

আরবী ভাষায় প্রত্যেক অবাধ্য ব্যক্তিই শয়তান, বহুবচনে শায়াত্বীন। শয়তান মানুষ ও জিন- উভয়ের মধ্য থেকেই হতে পারে। তবে শয়তান বললে সাধারণত ইবলীসকে বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ ইবলীসই শয়তানের সর্দার। এখানে তাফসীর ইবনে কাছীর থেকে ইবলীসের পরিচয় বর্ণনা করছি।

আদিতে ধরনীতে জিন জাতি বাস করত। জিন জাতির অধিকাংশই মারামারি, কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়। আর ইবলীস ছিল সৎকর্মশীল জিন। আল্লাহ ইবলীসকে ফেরেশতাদের সেনাবাহিনীসহ বদকার জিনদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। ইবলীস ও তার সাথীরা তাদেরকে মেরে কেটে সমুদ্র দ্বীপ ও পর্বতাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। ইবলীসের অন্তরে এই তাকাব্বুর পয়দা হয় যেম সে ছাড়া আর কারো দ্বারা এ কাজ সম্পাদন সম্ভব হয়নি। তার এই তাকাব্বুরের কথা আল্লাহ-ই জানতেন। তাই আল্লাহ যখন বললেন, আমি ধরণীতে আমার খলীফা পাঠাবো, ফেরেশতারা বলেন, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে পয়দা করবেন যে সেখানে ফাছাদ করবে ও রক্তপাত

করবে? তখন আল্লাহ বললেন, "আমি জানি তা, যা তোমরা জান না।" অর্থাৎ ইবলীসের অন্তরে যে তাকাব্বুর, তার খবর আমার কাছে আছে তোমাদের নেই।

আল্লাহ্ আদম ﷺকে পয়দা করে ফেরেশতাগণ ও ইবলীসকে আদেশ করলেন তাকে সম্মানার্থে সিজদাহ্ করতে। সকলে সিজদাহ্ করল কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, "আমি তার চেয়ে বেহতর। আপনি আমাকে আগুন থেকে পয়দা করেছেন আর তাকে তৈরি করেছেন কাদামাটি থেকে।"

আল্লাহ বললেন,

﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾

"তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। তুই বিতাড়িত।।

(সূরা সোয়াদ ৩৮ : ৭৭)

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

শয়তান বলল, আমাকে পূনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন তোকে অবকাশ দেয়া হলো। ইবলীস বলল, "আপনি যে আমাকে গোমরাহ করলেন এ কারণে আমিও ওঁৎ পেতে থাকব তাদের জন্য আপনার সরল পথে। এরপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিকে থেকে। ফলে আপনি তাদের আকছারকে শুকরিয়াগুজার পাবেন না।"

(সূরা আ'রাফ ৭: ১৪-১৭)

ইবলীস আদম ﷺ ও হাওয়া ﷺ-এর কাছে আল্লাহর নামে কছম করে বলে যে, সে তাদের নসীহতকারী। তাদের এই ধারণাই ছিল না যে আল্লাহর নামে কছম করে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে। এভাবেই তারা ইবলীসের ওয়াছওয়াছায় ভুলে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে নেন। এই অপরাধের শাস্তি ভোগের জন্য তাদেরকে মাটির ধরণীতে আসতে হয়।

শয়তান অন্যায় করে তওবা করে নি, চেয়েছিল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ। আর আদম ﷺ অপরাধ করে তওবা করেন, ফলে তিনি লাভ করেন দুনিয়ার হায়াত শেষে জান্নাতে ফিরে যাবার সুযোগ।

শয়তানের বিরতিহীন মেহনত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"আমি তোমার আগে যেসব নবী ও রাসূল পাঠিয়েছি তাদের কেউ কোন তামান্না করেছে তখনই শয়তান তার তামান্নায় বাধা-বিঘ্ন নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন।"

(সূরা আল-হাজ্জ ২২ ঃ ৫২)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

"এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিন শয়তানদের মধ্য থেকে দুশমন বানিয়েছি। ....অতএব তাদেরকেও তাদের মিথ্যা চর্চাকে ছেড়ে দাও।" (সূরা আনআম ৬ ঃ ১১২)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে শয়তানের দুষ্টামি নবীগণকেও মোকাবেলা করতে হত। আর শয়তান জিন ও মানুষ উভয়ের মধ্য থেকেই তৈরি হয়। ইবলীস হচ্ছে বড় শয়তান। আর ইবলীসের চেলারাও শয়তান।

বর্ণিত আছে, ওদ, ছুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর এই পাঁচ ব্যক্তি নেককার ছিলেন। তারা একই মাসে মারা যান। ফলে তাদের আত্মীয়গণ খুব শোকাতুর হয়ে পড়ে। তখন কাবীলের সন্তানদের মধ্যে একজন

তাদেরকে বলল, আমি এই পাঁচ ব্যক্তির সূরতে মূর্তি গড়ে দেব। কেবল এগুলিতে রূহ দিতে পারব না। তারা সম্মতি দিল। এভাবে মূর্তিকে সম্মান জানানোর রেওয়াজ চালু হল।

(তালবীছু ইবলীস, ইমাম ইবনে জাওযী, কায়রো ছাপা, পৃ. ৫৯)

ছালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নূহ ﷷ নৌকায় আরোহন করে এক অপরিচিত বুড়ো লোককে দেখে বললেন, তুমি কোথা থেকে এলে? সে বলল, আমি তোমার সাথীদের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করতে এসেছি, যাতে তাদের অন্তর আমার সাথে এবং দেহ তোমার সাথে থাকে। নূহ ﷷ বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই বের হ। ইবলীস বলল, পাঁচটি বস্তু দিয়ে আমি লোকদেরকে হালাক করি। পহেলা হিংসা যার কারণে আমি মালউন হয়েছি ও শয়তান হয়েছি। দোসরা লোভ। জান্নাতের সবকিছু আদম ﷷ-এর জন্য নির্দোষ ছিল। কিন্তু একটি বস্তুর লোভে ফেলে তাকে জান্নাত থেকে খারিজ করেছি। (তালবীছু ইবলীস, পৃ. ৩৮)

ইউসুফ ﷷ বলেন,

﴿أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾

"শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ পয়দা করেছিল।"
(সূরা ইউসুফ ১২ ঃ ১০০)

নবী করীম ﷺ বলেন, "ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে পাঠায়। ওদের মধ্যে যে বড় বড় ঝগড়া বাধায় সে শয়তানের কাছে বেশি প্রিয় হয়। একটি শয়তান এসে বলে আমি এমন করেছি তেমন করেছি। ইবলীস বলে, তুমি কিছুই করনি। অন্য এক শয়তান এসে বলে আমি অমুক ব্যক্তি ও তার পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি। ইবলীস বলে, হ্যাঁ, এটা বড় কাজ হয়েছে। (মুসলিম)

ছালেম বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বর্ণনা করেন, ইবলীস মূসা ﷷ-এর সাথে মোলাকাত করল এবং বলল, হে মূসা! আপনি তিনি যাকে আল্লাহ রিছালাতের জন্য বাছাই করেছেন, আর তিনি আপনার সাথে কথাও বলেন। আর আমি আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টি। আমি পাপ করেছিলাম। তওবা করতে চাই। আপনি আমার পালনকর্তার কাছে সুফারিশ করুন যেন তিনি আমার তওবা কবুল করেন।

মুসা ﷺ আল্লাহর নির্দেশমত ইবলীসকে বললেন, তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তুমি আদম ﷺ-এর কবরকে সিজদাহ্ করবে, তাহলে তোমার তওবা কবুল করা হবে। ইবলীস গোস্যা করে বলে, যাকে জিন্দা অবস্থায় সিজদাহ করলাম না, তাকে মুর্দা অবস্থায় সিজদাহ করব? হে মূসা! আপনি আমার জন্য শাফাআত করেছেন তাই বলছি আপনি তিনটি সময়ে আমাকে ইয়াদ করবেন, যাতে আপনাকে হালাক করে না দেই। আপনি গোস্যার সময়ে আমাকে ইয়াদ করবেন। আপনার কলবে আমার ওয়াছওয়াছা পৌছে। আপনার চোখে আমার চোখ নিবদ্ধ। আপনার রক্তের শীরায় আমি চলাচল করি। যুদ্ধ-সফরের সময় আমাকে ইয়াদ করবেন। আদম সন্তানকে তার সন্তান, পত্নী ও পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেই যতক্ষণ না সে পলায়ন করে। কোন মহিলার কাছে বসবেন না যখন তার সাথে তার মাহরাম না থাকে। কারণ আমি আপনার কাছে তার মনের খবর পৌছাই। তার কাছে আপনার মনের খবর পৌছাই।

(তালবীছু ইবলীস, পৃ. ৩৮)

বর্ণিত আছে, কুরাইশ গোত্রের আমর বিন লুহাই একজন গণক ছিল। একটি জিন তার মক্কেল ছিল। একদিন জিন তাকে বলল, জুদ্দাহ তীরে যাও, সেখানে কয়েকটি মূর্তি পাবে। সেগুলোকে নিয়ে এসো। আরবদেরকে এগুলির ইবাদত করার জন্য দাওয়াত দাও। আমর বিন লুহাই জিনের কথামত কাজ করে। (তালবীছু ইবলীস, পৃ. ৬০)

বস্তুত আমর ইবনে লুহাই আরবে মূর্তিপূজার রেওয়াজ চালু করে এবং ইসমাঈল ﷺ-এর দীনের বিকৃতি সাধন করে।

ছাবিত আলবানানী ﷺ বর্ণনা করেন, আমরা শুনেছি যে, একদা ইবলীস ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়্যা ﷺ-এর কাছে জাহের হয়। তিনি দেখলেন ইবলীসের দেহের সবখানে ঝুলন্ত রশি। তিনি বললেন, এ সব ঝুলন্ত রশি কি? ইবলীস বলল, "এগুলি লোভ-লালসা যা দিয়ে আমি আদম সন্তানকে বশীভূত করি। তিনি বললেন, আমার জন্যও তেমন কিছু আছে কি? ইবলীস বলল, যখন আপনি পেট ভরে আহার করেন তখন সালাত পড়া আপনার জন্য অসুবিধাজনক করে দেই। ইয়াহইয়া ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনও পেট ভরে খাব না। ইবলীস বলল, আল্লাহর শপথ, আমি আর কখনও মুসলিমকে নসীহত করব না।

(তালবীছু ইবলীস, পৃ. ৩৪)

আম্মাজান আয়েশা ﷺ-এর বোনপো উরওয়া ﷺ বর্ণনা করেন, আয়েশা ﷺ বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার কাছ থেকে বাইরে বের হন। এরপর তিনি ফিরে আসেন এবং তাকে চিন্তান্বিত দেখেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! তোমার কি হয়েছে? তোমার কি হিংসা হচ্ছে? আমি বললাম, আপনি অন্য মহিষীর কাছে যাবেন আর আমার হিংসা হবে না? তিনি বললেন, তোমার উপর কি শয়তান আধিপত্য বিস্তার করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সাথে শয়তান আছে না কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সকল লোকের সাথেই কি থাকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার সাথেও আছে না কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমার পালনকর্তা আমাকে আমার শয়তানের উপর আধিপত্য দিয়েছেন এবং সে মুসলিম হয়ে গেছে। (মুসলিম)

আব্দুর রহমান তামিমী ﷺ বলেন, এক রাতে শয়তানের বাহিনী জঙ্গল ও পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺকে আক্রমণ করল। ওদের মধ্যে একটি শয়তান তার মুখমন্ডল জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুন নিয়ে এগিয়ে এল। এমন সময় জিবরাঈল ﷺ এলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা .... ইয়া রহমান" এই দোয়া পড়া শেষ হতেই আগুন নিভে গেল, আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করলেন।

আহমদ, মুয়াত্তা, মালিক; আততারগীব, ইমাম মুনযিরী

এক ব্যক্তি হাসান বসরী (রহঃ)কে বললেন, ইবলীস কি ঘুমায়? তিনি বললেন, সে ঘুমালে আমরা অনেক আরামে থাকতাম।

(তালবীছু ইবলীস, ৪৬)

সীরা (রহঃ) বলেন, শয়তান বিভিন্ন পন্থায় আদম সন্তানকে পথহারা করে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলে তুমি কি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করবে? কিন্তু লোকটি শয়তানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম কবুল করে। এরপর সে লোকটির হিজরতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে তুমি নিজ দেশ ছেড়ে কেন হিজরত করছ? মুহাজিরের মর্যাদা একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি হয় না। কিন্তু সে তার কথা

অমান্য করে এবং হিজরত করে। এবার শয়তান তার জিহাদের পথে এসে বসে পড়ে এবং বলে, তুমি ত নিহত হয়ে যাবে এবং অন্যের সাথে তোমার পত্নীর নিকাহ হয়ে যাবে। আর তোমার মালমাত্তা অন্যরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে। তবুও সে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এই কাজ করে এবং মারা যায় তাকে জান্নাতে জায়গা দেয়া আল্লাহর জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে, হয় সে শহীদ হোক বা পথে ঘুরে মরুক বা পথে কোন জানোয়ার দ্বারা পদদলিত হোক।

(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরাহ আরাফ, ১৬নং আয়াতের তাফসীর)

ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, "ওয়ায়েয ও কাহিনীকারগণের মধ্যে একটি সম্প্রসায় উৎসাহ ও ভীতি সঞ্চার বিষয়ে মিথ্যা হাদীস তৈরি করে। ইবলীস তাদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, লোকদেরকে পুণ্যের প্রতি উৎসাহিত ও পাপ থেকে বিরত রাখার মানসেই হাদীস তৈরি করছ। ভাবখানা এমন যে, শরীয়ত অসম্পূর্ণ; তাকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য এসব হাদীস তৈরির জরুরত আছে। তারা ভুলে যায় যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

যে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। (বুখারী, মুসলিম) (তালবীছু ইবলীস, পৃ. ১২৮)

শিয়ারা অনেক মিথ্যা হাদীস বানিয়েছে। তাদের মতবাদকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ইতিহাসে স্বীকৃত তথ্য হচ্ছে আলী رضي الله عنه খারিজী ইবনে মুলজিমের আঘাতে শহীদ হলে হাসান رضي الله عنه তাকে কুফা শহরে তার বাড়ির মধ্যে দাফন করেন যাতে খারিজীরা তার লাশের অবমাননা করার সুযোগ না পায়।

(আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনে কাছীর, ৭ম খ-, পৃ. ৩৩০)

আলী رضي الله عنه-এর শাহাদতের পর তিনশত বছর পর্যন্ত কেউ বলেনি যে তার কবর নাজাফ শহরে। এরপর শিয়ারা প্রচার করে যে আলী رضي الله عنهকে দাফন না করে উটের পিঠের উপর ছেড়ে দেয়া হয়, উটটি হারিয়ে যায়, নাজাফে তার কবরের খোঁজ পাওয়া যায় ইত্যাদি। এসবই মিথ্যা কথা। শিয়ারা নাজাফকে বলে নাজাফ আল আশরাফ। মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ

আর নাজাফ আল-আশরাফ! এভাবে শয়তান কয়েকটি গুনাহ করিয়ে নিচ্ছে। এক, মিথ্যা কবর যিয়ারত করা যাকে হাদীসে শিরকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুই, মক্কা ও মদীনার চেয়ে নাজাফকে বেশি সম্মানিত মনে করা হচ্ছে। অথচ কুরআন ও হাদীসে মক্কা ও মদীনার সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হয়েছে।

শিয়াদের বানানো অনেক মিথ্যা হাদীস ও কেচ্ছা সুন্নীদের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে। 'বিষাদ সিন্ধু' পুস্তকটির নব্বই শতাংশ তথ্যই মিথ্যা। যেমন নবী ﷺ কর্তৃক মুআবিয়া ؓকে ভবিষ্যদ্বাণী করা, হানুফা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা, হুসায়নের গলায় বারবার ছুরির আঘাতে ক্ষত না হওয়া, সীমারকে জান্নাতে নিতে ওয়াদা করা ইত্যাদি সব মিথ্যা তথ্য।

(হাদীসের নামে জালিয়াতি, ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ৩০২)

মুখতার ছাকাফী একজন রাফেযী ছিল। ৬০ হিজরীতে কারবালায় হুসায়ন ؓ-এর শাহাদাতের পরে তিনি ৬৪/৬৫ হিজরীতে মক্কায় শাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ؓ-এর পক্ষ থেকে কুফায় গমন করেন। কুফায় তিনি হুসাইন ؓ-এর হত্যায় জড়িতদেরকে ধরে হত্যা করতে থাকেন। এরপর তিনি ইবনে যুবায়ের ؓ-এর আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকে ইলহাম প্রাপ্ত, নবী করীম ﷺ এর বিশেষ খলীফা ইত্যাদি দাবি করতে থাকেন। তার এসব দাবির সত্যতা ছাবিত করার জন্য তিনি কয়েকজন ব্যক্তিকে তার পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনার জন্য আদেশ, অনুরোধ ও উৎসাহ দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার তারীখে কবীর ও তারীখে সগীর কিতাবে লিখেছেন।

ইবনে রাবিয়া খুযায়ী (রাঃ)কে মুখতার ছাকাফী বলে, "আপনি ত নবী ﷺ-এর জমানা পেয়েছে। আপনি যদি নবী ﷺ-এর নামে কোন কথা বলেন, তবে মানুষ তা বিশ্বাস করবে। নবী ﷺ-এর নামে আমার পক্ষে একটি হাদীস বর্ণনা করে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। আপনাকে সাতশত স্বর্ণ-মুদ্রা দিব। খুযায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার পরিনাম জাহান্নাম। আমি তা বলতে পারব না।

ইবনে আবী হাতিম তার 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' কিতাবে লিখেছেন, মুখতার ছাকাফী মুহাম্মদ বিন আম্মার (রহঃ)কে তার পিতা আম্মার বিন ইয়াসার ﷺ-এর সূত্রে তার পক্ষে হাদীস বানিয়ে প্রচার করতে নির্দেশ দেয়। তিনি অস্বীকার করলে মুখতার তাকে হত্যা করে। অনেকে তার পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছে শয়তানের ফাঁদে পড়ে। অবশেষে মুখতার ছাকাফী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ﷺ-এর বাহিনীর কাছে ৬৭ হিজরীতে পরাজিত ও নিহত হয়।

সম্প্রতি ইরানের সরকারী টেলিভিশন চ্যানেলে 'মুখতার নামা' নামে ড্রামা সিরিয়াল প্রদর্শিত হয়, যাতে মুখতার ছাকাফীকে মহান প্রতিশোধ গ্রহণকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই ড্রামা সিরিয়ালে অনেক মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এসব মিথ্যা যারা প্রচার করে তার জ্ঞানপাপী।

আল্লাহ জ্ঞানপাপীদের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾

শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের নযরে শোভনীয় দেখিয়েছিল, তাদেরকে ঠিক পথে চলতে বাধা দিয়েছিল যদিও তারা ছিল তীক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী। (সূরা আল-আনকাবুত ২৯ ঃ ৩৮)

তাবিয়ী আব্দুল আজীজ বিন রাফী (রহঃ) বলেন, যখন মুমিন রূহকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, পবিত্রতা তাঁর যিনি এই বান্দাকে শয়তান থেকে নাজাত দিয়েছেন। কিভাবে সে শয়তান থেকে নাজাত পেল? (তালবীছু ইবলীস, ৪২)

শয়তানের ছোবল থেকে বাঁচার জন্য সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া দরকার। এছাড়া কিছু আমাল রয়েছে যেগুলি এখন লেখা সম্ভব হল না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে লেখার নিয়ত রইল। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

[মুসলিম ডাইজেস্ট, জুন-২০১১]

লোক দেখানো ইবাদতের দুঃখজনক আকবত

মাহমুদ বিন লাবীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে ভয়ের বিষয় যা আমি ভয় পাচ্ছি তা হচ্ছে আশ-শিরকুল আসগার – এটা হল রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো ধর্মাচরণ)। (আহমদ)

উল্লেখিত হাদীস থেকে জানা যায় নবী ﷺ তার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করেছিলেন যে তাদের অনেকেই লোক দেখানো ধর্মাচরণ করবে এবং এর দ্বারা ছোট শিরক করবে। তারা বুঝতেও পারবে না যে তারা শিরক করছে।

নবী ﷺ বলেন, সামান্য রিয়া-ও শিরক। (ইবনু মাজাহ)

শাদ্দাদ ইবনু আওছ ﷺ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, অন্যকে দেখানোর জন্য যে সালাত পড়ল সে শিরক করল। অন্যকে দেখানোর জন্য সে সওম রাখল সে শিরক করল। (আহমদ)

বস্তুতঃ সমস্ত ইবাদতের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ যদি উদ্দেশ্য না হয় তবে আমলসমূহ ইহবাত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

তুমি বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে তার জন্য ধর্মকে ইখলাসপূর্ণ রাখতে। (সূরা আয-যূমার ৩৯ : ১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾

যখন তারা (মুনাফিকরা) সালাতে দাঁড়ায় তারা দাঁড়ায় অলসভাবে, লোকদেরকে দেখায় আর তারা অল্প পরিমাণ ছাড়া [আল্লাহর] যিকির করে না।

(সূরা আন-নিসা ৪ : ১৪২)

আবু সাঈদ আনসারী ﷺ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কিয়ামত দিবসে মানুষকে জমা করবেন যে দিবসে কোন সন্দেহ নাই। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহর জন্য করা কাজে যে অন্য কাউকে শরীক করে, সে সেই কাজের ছওয়াব তার কাছে তলব করুক। (তিরমিযী)

সালাত, সিয়াম, হজ্জ, সাদকা ইত্যাদি বিভিন্ন আমলে বিভিন্নভাবে রিয়া সংঘটিত হয়।

নবী ﷺ বলেন, খফী (গোপন) শিরক এ রকম এক ব্যক্তি সালাত পড়তে দাঁড়াল, এরপর সে সালাতকে খুব সুন্দরভাবে পড়ল যেন অন্য লোকেরা তা দেখে। (ইবনু মাজাহ)

নবী ﷺ বলেন, কিয়ামত দিবসে পহেলা যাদের বিচার করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে এক ব্যক্তি যাকে শহীদ করা হয়েছিল। তাকে আনা হবে, তাকে দেওয়া নিয়ামতসমূহ জানানো হবে, সে সেগুলোকে চিনতে পারবে। তাকে আল্লাহ বলবেন, 'এগুলো দিয়ে তুমি কী কাজ করেছ?" সে বলবে, "আমাকে শহীদ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি।" তিনি বলবেন, 'মিথ্যা বলছ, তুমি যুদ্ধ করেছ যাতে তোমাকে বীর বলা হয়। তা ত বলা হয়েছে।" এরপর তাকে আদেশ শোনানো হবে এবং উল্টা মুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর একজন লোক এলেম শিখেছিল, অন্যকে শিখাত এবং কুরআন ক্বিরাআত করত। তাকে দেওয়া নিয়ামতসমূহ জানানো হবে, যে গুলোকে সে চিনবে। তিনি তাকে বলবেন, "এগুলি দিয়ে তুমি কী আমল করেছ?" যে বলবে, এলেম শিখেছি, অন্যকে শিখায়েছি, কুরআন ক্বিরাআত করেছি।" তিনি বলবেন, "মিথ্যা বলছ। তুমি এলেম শিখেছ যেন লোকে আলেম বলে আর কুরআন পড়েছ যাতে লোকে বলে সে একজন ক্বারী। এমন ত বলা হয়েছে" এরপর তাকে আদেশ শোনানো হবে এবং উল্টা মুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর একজন থাকবে যাকে অনেক মাল দেয়া হয়েছিল। তাকে আনা হবে, তার নিয়ামতসমূহ জানানো হবে, যেগুলোকে সে চিনবে। তিনি বলবেন, 'এগুলি দিয়ে তুমি কী আমল করেছ?" সে বলবে, "আপনার [সন্তুষ্টির] জন্য ছাড়া অন্য কোন

কারণে আপনার পছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করিনি।" তিনি বলবেন, "মিথ্যা বলছ, তুমি এমন করেছ যাতে তোমাকে দাতা বলা হয়। তা ত বলা হয়েছে।" এরপর আদেশ শোনানো হবে এবং উল্টামুখে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

সালাতে রিয়া

পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে পড়া প্রকাশ্য ইবাদত। এগুলি প্রকাশ্যে করতেই হবে। রিয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নফল সালাত গোপনে পড়া যেতে পারে। যায়েদ বিন ছাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, পুরুষদের জন্য ফরয ব্যতীত অন্যান্য সালাত ঘরে পড়াই বেহতর। (নাছায়ী)

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ) তার 'তালবীছু ইবলীস' কিতাবে লিখেছেন, "এমনও লোক দেখা যায় যে সে লোক সমাবেশে বা জামাআতে সালাত পড়ার সময় (ক্বিরাআত করা বা শোনার সময়) কেঁদে ফেলে। যদিও এটা তার মনের কোমলতার দরুন হয়ে থাকে তবুও দমন করে রাখা উচিত। অন্যথায় এটা রিয়ায় রূপান্তরিত হবে। আসেম (রহঃ) বলেন, "আবু ওয়ায়েল যখন ঘরের কোনে সালাত পড়তেন তখন তার কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। কারো সামনে এমন করতে বললে তিনি কখনও করতেন না।" (তালবীছু ইবলীস, কায়রো ছাপা, পৃঃ ১৪৮)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, "সবচেয়ে আজব ঘটনা আমি দেখেছি যে একজন ক্বারী প্রত্যেক জুমাবার ফজর সালাতের সালাম ফিরিয়ে সূরাহ ইখলাস, ফালাক, নাস এবং কুরআন খতমের দোয়া পড়েন। এতে মুসল্লীগণ বুঝতে পারেন যে হযরত আজ কুরআন খতম করেছেন। এটা পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নিয়ম ছিল না। তারা তাদের ইবাদত যথাসাধ্য গোপন রাখতেন।" (তালবীছু ইবলীস, পৃঃ ১৪৯)

যাকাত সাদকা করার সময় রিয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

যদি তোমরা সাদকাসমূহ জাহির কর তা ভালো, আর যদি তা খফী রাখ এবং ফকীরদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য বেহতর।

(সূরা আল-বাক্বরাহ ২ ঃ ২৭১)

﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ﴾

আর তোমরা আল্লাহর সন্তোষ লাভের মাকসাদ ছাড়া খরচ করো না।

(সূরা আল-বাক্বরাহ ২ ঃ ২৭২)

সিয়াম পালনে রিয়া

অধিক নফল সিয়াম পালন করায় কারো কারো সিয়াম পালনকারী হিসাবে লোকসমাজে খ্যাতি হয়ে যায়। এই খ্যাতি অনেক সময় তার মনে অহংকার ও রিয়ার অবির্ভাব ঘটায়।

ইমাম ইবনু জাওযী লিখেছেন, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, এক ব্যক্তি তার যমানার শ্রেষ্ঠ ওলীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক তাকে দেখতে আসত এবং তাকে খুব একরাম করত। একদিন তিনি তার দর্শকদের সমাবেশে বললেন, "আমি রিয়া ও অহংকারের ভয়ে লোক সমাজকে পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু ধনীর ধন তাকে যত ক্ষতি না করে আজ ইবাদতকারীর ইবাদত তাকে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে। আমাদের প্রত্যেকেই এমন চায় সে তার দীনদাবীর জন্য তার জরুরত পুরা করে দেয়া হোক। কোন জিনিস কিনতে গেলে লোকে যেন তার কাছ থেকে দাম কম নেয় তার দীনদার হওয়ার কারণে।" একবার বাদশাহ ঐ দরবেশকে সালাম করার জন্য রাজধানী থেকে দরবেশের আস্তানার দিকে রওনা হন। দরবেশ এই খবর পেয়ে চিন্তিত হলেন এবং খাদেমকে বললেন, খাবার কিছু থাকলে আন। খাদেম কিছু ফলমুল এনে দিল। তিনি খাওয়া শুরু করলেন। অথচ তিনি প্রায় সারা বছর সিয়াম পালন করতেন। বাদশাহ এসে তাকে সালাম দিলেন, তিনি নিচু স্বরে সালামের জওয়াব দিয়ে খাওয়ায় মনোনিবেশ করলেন। বাদশাহ বললেন, সেই দরবেশ কোথায়?

কেউ বলল, এখানেই আছেন।

বাদশাহ বললেন, যিনি খাচ্ছেন?

বলা হল জ্বি হ্যাঁ।

বাদশাহ বললেন, তার সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তেমন কিছু ত দেখতে পেলাম না।

একথা বলে বাদশাহ ফিরে চলে গেলেন।

দরবেশ বললেন, আল্লাহকে শুকরিয়া জানাচ্ছি যে তিনি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। (তালবীছু ইবলীস, পৃঃ ১৫৯-১৬০)

আল্লাহর ওলীদের ইবাদতের ধারা এমনই ছিল।

খুতবা ও ওয়ায করায় রিয়া

নবী ﷺ বলেন, "কোন বান্দা নেই যে খুতবা দেয় কিন্তু আল্লাহ সে সম্পর্কে সওয়াল করবেন না যে এতে তার এরাদা কী ছিল।"

জাফর (রহঃ) বলেন, মালেক বিন দীনার (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনার সময় এত বেশি কাঁদতেন যে তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত। তারপর তিনি বলতেন, মানুষ মনে করে তোমাদের সামনে আমার কথা বলার মাধ্যমে আমার চোখ শীতল হয়, কিন্তু আমি জানি, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ আমাকে সওয়াল করবেন এর এরাদা কী ছিল? (বাইহাকী)

জিহাদের ময়দানে রিয়া

আমরা আগে একটি হাদীস জেনেছি যে, কিয়ামত দিবসে একজন শহীদ, একজন আলেম ও একজন বীরের হিছাব নিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

'বীর' হিসাবে খ্যাতি লাভের জন্য জিহাদ করলে ঐ মেহনত দুর্ভোগের কারণ হবে।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) লিখেছেন, আব্দুহ বিন সালমান বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহ)-এর সাথে রোম যুদ্ধে যাই। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ালে দুশমনপক্ষের একজন এসে আমাদের

পক্ষের একজনকে আহ্বান করে। আমাদের পক্ষের একজন গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুশমন সেনাকে কতল করলেন। এভাবে একে একে চারজন দুশমন সেনাকে কতল করায় আমাদের পক্ষের লোকজন দেখতে গেল কে এই বাহাদুর। আমিও তাদের সাথে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি তার বড় আমামা দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। আমি জোর করে আমামা খুলে দেখলাম তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক। তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুহ, তুমিও কি ঐসব লোকদের মধ্যে একজন যারা আমাকে অপদস্থ করতে চায়? অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক কখনও এটা পছন্দ করতেন না যে কেউ তার বীরত্ব দেখে সুনাম করুক। (তালবীছু ইবলীস, পৃঃ ১৫৩)

আবু উবায়দা আসরী (রহঃ) বলেন, পারস্য রাজধানী মাদায়েন জয় করার পর সকলে গণীমতের মাল জমা করতে লাগল। এমন সময় এক ব্যক্তি মোতির এক বাক্স এনে হিসাবরক্ষকের কাছে জমা দিলেন। এটা দেখে সকলেই বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা এত মূল্যবান বস্তু কখনও দেখিনি। সমস্ত গণীমত মালও এর সমমূল্যের হবে না। এক ব্যক্তি বললেন, তুমি কি তা থেকে কিছু নিয়েছ? সেই ব্যক্তি বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি আমি আল্লাহকে ভয় না করতাম তবে তার একটিও জমা দিতাম না। সকলে বুঝলেন সে এই ব্যক্তি ঈমান অতি উচ্চ পর্যায়ের। লোকে তার পরিচয় সওয়াল করলে তিনি বললেন, আমার পরিচয় তোমাদেরকে দিব না। কারণ তোমরা আমার সুনাম করবে অথবা আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কিছু বলবে এরপর গোপনে খবর নিয়ে জানা গেল তিনি আমের ইবনু আবদে কায়েস (রাঃ)। (তালবীছু ইবলীস, পৃঃ ১৫৩)

হজ্জ-এ রিয়া

ইখলাস না থাকলে হজ্জ ও লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। এমন কি দেখা যায় অনেক হাজীকে হাজী বা আলহাজ্জ না বললে মনে করেন তাকে অসম্মান করা হল। অথচ সালাত পড়লে কারো নামের সাথে মুসল্লী যোগ করা হয় না, সিয়াম পালন করলে 'সায়িম' যোগ করা হয় না। কিন্তু হজ্জ করলে হাজী বলা হয়।

নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের উপর এমন সামান্য আসবে মানুষের মধ্যে ধনী লোকেরা হজ্জ করবে দেশভ্রমণের জন্য, মধ্যবিত্তরা তেজারতের জন্য, ফকীররা সুওয়াল করার জন্য এবং ক্বারীগণ সুনাম ও রিয়ার জন্য। (দায়লামী)

পোশাক-পরিচ্ছদে রিয়া

নবী ﷺ বলেন, যে প্রসিদ্ধি লাভের পোশাক পরে, তা খুলে না ফেলা পর্যন্ত আল্লাহ তার দিক থেকে নযর ফিরিয়ে রাখেন। (ইবনে মাজাহ, যঈফ)

নবী করীম ﷺ বলেন, যে অহংকার দেখানোর জন্য কোন লেবাছ পরে এবং মানুষ তার দিকে নযর দেয়, সে পোশাক না খোলা পর্যন্ত আল্লাহ তার দিকে নযর দেন না। (তাবারানী)

এক লোক ইবনে উমর ؓ এর কাছে আনতে চাইলেন, আমি কেমন পোশাক পরব? তিনি বললেন, এমন পোশাক পরবে যাতে আহম্মকরা তোমাকে তুচ্ছ মনে না করে এবং জ্ঞানীরা তোমাকে দোষী মনে না করে। (তাবারানী)

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ؓ বলেন, বাহিরে একদল সাহাবী নবী ﷺ - এর এন্তেযারে ছিলেন। নবী ﷺ তাদের সাথে মোলাকাত করবে জন্য উঠলেন। ঘরে একটি পাত্রে পানি ভরা ছিল। সেই পানিতে নিজের চেহারা দেখে তিনি নিজ দাড়ি ও চুল ঠিক করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও এমন করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লোক যখন তার ভাইদের সাথে মোলাকাত করতে যায় তখন যেন নিজকে ঠিক করে নেয়। কারণ আল্লাহ্ জামীল এবং তিনি জামালকে (সৌন্দর্য) মহব্বত করেন। (ইবনুস সুন্নী, যঈফ; তবে শেষাংশ সহীহ মুসলিমে আছে)

ইমাম ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) লিখেছেন, কোন কোন দরবেশ ছেড়া ফাটা কাপড় পরেন, সেলাই করেন না। আমামা ঠিক করে বাধেন না, দাড়ি

এলোমেলো রেখে দেন। লোকে তার এই হাল দেখে মনে করে ইবাদতে মশগুল থাকার দরুনই হযরত এ সবের দিকে খেয়াল করতে পারেন না। এতেও রিয়া হয়। রসূলুল্লাহ (স.) ও তার সাহাবাদের নীতি এমন ছিল না।

(তালবীছু ইবলীস পৃষ্ঠা ১৬২)

অনেক মূল্যবান পোশাকে যেমন রিয়া হতে পারে, তেমনি গরীব দেখানোর পোশাকের মাধ্যমেও রিয়া হতে পারে।

রিয়া আমলকে ইহবাত করে দেয় এমন কি এর মাধ্যমে শিরকও হয়। আল্লাহ আমাদেরকে রিয়া থেকে বাঁচান।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে পানাহ চাই এমন শিরক থেকে যা আমরা জানি আর আমরা আপনার কাছে এস্তেগফার করছি তা থেকে যা আমরা জানি না। (আহমদ)
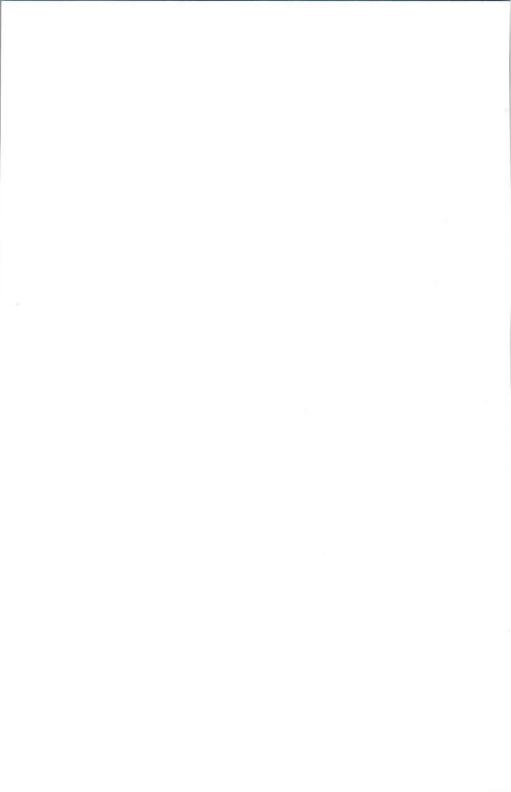
তথ্যসূত্র

১। তাফসীরে ইবনে কাছীর, বাংলা তরজমা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

২। তাফসীর তাইসীরুল কুরআন (বাংলা), অধ্যাপক মোযাম্মেল হক, সৌদি আরব।

৩। সহীহ বুখারী, বাংলা তরজমা, ই.ফা.বা, ঢাকা।

৪। সহীহ মুসলিম, সম্পাদনা ড. ফুয়াদ আব্দুল বাকী, কায়রো ছাপা।

৫। সুনানু আবু দাউদ, সম্পাদনা জুবাইর আলী জাই, ইংরেজি তরজমা- ইয়াসির কাজী, দারুস সালাম পাবলিকেশন, রিয়াদ।

৬। সুনানু নাছায়ী, বাংলা তরজমা, ই.ফা.বা., ঢাকা।

৭। সুনানু ইবনে মাজাহ, বাংলা তরজমা, ই.ফা.বা., ঢাকা।

৮। বুলূগুল মারাম, আল-আসকালানী, বাংলা তরজমা, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা।

৯। তাফসীর জাদুল মাসীর, ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো।

১০। তালবীছু ইবলীস, ইবনুল জাওযী, দারুল হাদীস, কায়রো।

১১। সয়দুল খাতির, ইবনুল জাওযী, মাকতাব ছাকাফী, কায়রো।

১২। শরহুস সুন্নাহ, ইমাম আল বারবাহারী, ইংলিশ তরজমা, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোডকৃত।

১৩। হাদীসের নামে জালিয়াতি, ডঃ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ঝিনাইদহ।

১৪। খুতবাতে মুহম্মদী, অধ্যাপক সহীফুল ইসলাম সালাফী, ঢাকা।

১৫। Basis of Maslim Belief, Abdul Ahad Omar, Mulsim Converts Association of Singapore.

১৬। Missionary Christianity, Abdul Ahad Omar, IPCI, Birmingham.

১৭। Dialogue with an Atheist, Dr. Mostafa Mahmoud, Dar Al Taqwa Ltd, 1994.

১৮। The Evolution of Fiqh, Abu Ameenah Bilal, IIPH, Riyadh

১৯। The Jamaat Tableegh and The Deobandis, Sajid Abdul Qayyum downloaded from internet.

أآلهة وافرحق
أم إله واحدٌ

ARE MANY GODS TRUE OR ONE GOD?

A.K. Anisur Rahman